গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৮ বর্ষ ২০ সংখ্যা ২৩ - ২৯ ডিসেম্বর, ২০০৫ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

পার্লামেন্টারি দলগুলো আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত কেন

নির্বাচিত এম পি-রা পার্লামেন্টে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন উত্থাপন করবেন, আলাপ-আলোচনা এবং বিতর্কে অংশ নেবেন — এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু পরিবর্তে তাঁরা যখন শিল্পপতি-পুঁজিপতি-ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর থেকে টাকা খেয়ে তাদেরই স্বার্থপূরণের লক্ষ্যে পার্লামেন্টে প্রশ্ন উত্থাপন করেন, তখন এই জনপ্রতিনিধিদের চরিত্রের স্বরূপ যেমন উদঘাটিত হয়ে যায় তেমনি এও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পার্লামেন্ট কাদের স্বার্থ পূরণের ঘাঁটিতে পরিণত। সম্প্রতি এমন ১১ জন এম পি পার্লামেন্টে প্রশ্ন তোলার চুক্তিতে ঘুষ নেবার সময় গোপন ক্যামেরায় ধরা পড়েছেন। ১৩ ডিসেম্বরের প্রতিটি দৈনিকের প্রথম পাতার হেডলাইন ছিল এটাই। অভিযুক্ত এম পি-দের বিরুদ্ধে ধিক্কার ধ্বনিত হয়েছে দেশজুড়ে, সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়তে, এমনকী সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃত্বের কণ্ঠেও। লোকসভা থেকে অভিযুক্তদের সাময়িকভাবে বরখাস্তও করা হয়েছে। বিজেপি নেতৃত্ব বলেছে, ১১ জন অভিযুক্ত এম পি-র মধ্যে তাঁদের ৬ জন আছেন বলেই প্রমাণ হয় না যে, বিজেপি সর্বাপেক্ষা বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত। কি হাস্যকর যুক্তি! ১১ জন দাগি সাংসদের অর্ধেকের বেশিই তাদের তবু তার দ্বারা নাকি তাদের সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ততা প্রমাণ হয় না। তাঁরা যদি যুক্তি দিতেন যে, কজনই বা ধরা পড়েছে, তদন্ত হলে প্রমাণ হয়ে যাবে — কংগ্রেস বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত, তাহলে না হয় যুক্তির ধারাটা বোঝা যেত। তা তাঁরা বললেন না। বোঝাই যায়, ঘটনার আকস্মিকতায় বিজেপি নেতারা বেসামাল হয়ে পড়েছেন।

এই ঘটনা প্রকাশ পাওয়ার পর ভারতের পার্লামেন্ট সদস্যরা চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। এখনই তদন্তের দাবি উঠেছে। পার্লামেন্টের পবিত্রতা গেল গেল বলে রব তোলা হয়েছে। কিন্তু এমন দুর্নীতির ঘটনা তো এবারই প্রথম নয়। ইতিপূর্বে এর চেয়েও বড় আকারের কেলেঙ্কারিতে মন্ত্রী ও সাংসদদের যুক্ত থাকার ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে। মজার ব্যাপার হল, একটি ক্ষেত্রেও অভিযুক্তরা শাস্তি পায়নি। দিনকয়েক কাগজে-পত্রে সংবাদমাধ্যমে হৈচৈ, তারপর সব যেমন ছিল তেমনই আছে।

পার্লামেন্টে বিভিন্ন শিল্পপতি ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর 'লবি' যে কাজ করে, বিভিন্ন মন্ত্রী ও এম পি যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর এজেন্টের ভূমিকা পালন করেন এবং এই গোষ্ঠীগুলিকে নানা সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দেন, সেই সুবাদে জনগণের ঘাড় ভেঙে ট্যাক্স হিসেবে আদায় করা হাজার হাজার কোটি টাকা যে শিল্পপতি-ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর মুনাফার ভাণ্ডারে ঢোকে — এই সব তথ্য আজ 'ওপন সিক্রেট।' কোন্ মন্ত্রী, কোন্ সাংসদ কোন্ শিল্পপতির বা কোন্ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর এজেন্ট, এঁরা পার্লামেন্টে ও সরকারের কাছে কাদের হয়ে তদ্বির করেন ইত্যাদি বিষয় বিভিন্ন সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয়েছে। এঁদেরকে যেকোন মূল্যে জিতিয়ে পার্লামেন্টে নিয়ে যাবার জন্য বিশেষ বিশেষ শিল্পপতি সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। আমাদের এ রাজ্যের এক বামপন্থী সাংসদ সম্পর্কে তো এমন সংবাদ খবর কাগজেই বেরিয়ে গেছে। প্রশ্ন হল, এসবের পিছনে কি দুর্নীতির কালো ছায়া নেই? লেনদেন নেই? তা যদি না থাকে তবে কীসের ইঙ্গিতে, কার অঙ্গুলিহেলনে এসব নির্বিঘ্নে ঘটতে পারে?

মন্ত্রীমহলে বিভিন্ন ব্যবসাদার গোষ্ঠীর লেনদেন-কথাবার্তা চলে। পরিকল্পনা অনুযায়ী কোন এম পি পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বিষয়টি উত্থাপন করলেই মন্ত্রী তাতে স্বাক্ষর বসিয়ে দেন, যেন গণতান্ত্রিক রীতি মেনেই সব হল। পুতুল নাচের অন্দরমহলের সুতোর টান থেকে যায় লোকচক্ষুর অন্তরালে। কিংবা কোন মন্ত্রী বিশেষ কোন শিল্পগোষ্ঠীকে বিশেষ কোন অর্ডার পাইয়ে দিচ্ছেন ভিতরে ভিতরে; অন্য শিল্পপতি সেটা জানতে পেরে বিশেষ কোন এম পি-কে দিয়ে সে বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন ও সন্দেহ উত্থাপন করে দিলেন পার্লামেন্টে। তাই নিয়ে হৈ চৈ হল, লেখাপত্র বেরুল। মন্ত্রী আটকে গেলেন।

১১ জন দাগি সাংসদের নাম এবার প্রকাশিত হবার পর একটা অদ্ভুত ঘটনা নজরে এসেছে। তেল কেনা সংক্রান্ত দুর্নীতি ভলকার ইসু নিয়ে বিজেপি চেপে ধরেছিল কংগ্রেসকে; পার্লামেন্ট অচল করে রাখছিল মন্ত্রীসভা থেকে নটবর সিং-এর এবং ইউ পি এ-র চেয়ারপার্সন পদ থেকে সোনিয়া গান্ধীর পদত্যাগের দাবিতে। কিন্তু, বিজেপির ৬ জন সহ মোট ১১ জন দাগি সাংসদের নাম যেই প্রকাশ্যে

তিনের পাতায় দেখুন

পুঁজির শোষণের চরিত্র এখন সিপিএম নেতাদের চোখে পড়ে না

এরাজ্যে বিদেশি লগ্নিপুঁজি বিনিয়োগ প্রসঙ্গে গণমাধ্যমে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক তথা পলিটব্যুরো সদস্য অনিল বিশ্বাস মন্তব্য করেছেন, পুঁজির সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র নেই, সাম্রাজ্যবাদ একটা রাজনৈতিক বিষয়। তিনি আরও বলেছেন, ''সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই সবসময় জারি আছে, আগামী দিনেও তা থাকবে। আর, পুঁজির রঙ দেখে তো শিল্পে বিনিয়োগ হয় না।'' (গণশক্তি ২২-১০-০৫)। দূরদর্শনে তিনি এও বলেছেন, সব মার্কিন পুঁজিকে তাঁরা সাম্রাজ্যবাদী মনে করেন না। আবার বলেছেন, ''পুঁজি ক্ষুধা নিবারণ করে আর সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করে।'' অনিল বিশ্বাসের সাথে সুর মিলিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছেন, ''পুঁজির কোন রঙ নেই, আমেরিকান পুঁজিকে আমন্ত্রণ জানানোর অর্থ এই নয় যে, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের সাথে সহমত হওয়া।'' (গণবার্তা ২৬ নভেম্বর) তাঁদের এসব কথা থেকে যেটা বেরিয়ে আসে তা হল — (১) পুঁজি শোষণ করে না, (২) শ্রমিকশ্রেণী তথা জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া শোষণমূলক ব্যবস্থার সাথে পুঁজির কোন সম্পর্ক নেই, (৩) পুঁজি হচ্ছে একটা কল্যাণকর বস্তু যা মানুষের দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নিবারণ করে।

পুঁজির শাসন ও শোষণ যখন ভারত তথা সমগ্র বিশ্বে সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার, সুস্থভাবে জীবন যাপন করার অধিকার কেড়ে নিচ্ছে তখন পুঁজির সমর্থনে এহেন নির্লজ্জ ওকালতি যেকোন বিবেকবান মানুষকেই লজ্জা দেয়। ইতিহাস দেখি::::::য়েছে পুঁজিবাদের বর্তমান অবক্ষয়ের যুগে যত বেশি পুঁজি বিনিয়োগ হয়েছে তত মানুষের দারিদ্র্য বেড়েছে, বেকারি বেড়েছে, আর পাশাপাশি পুঁজিপতিদের মুনাফার ভাণ্ডার ততই স্ফীত হয়েছে। অর্থাৎ মনুষ্যশ্রম বা শ্রমিক শ্রেণীর শ্রমশক্তি প্রাকৃতিক সম্পদের সাথে যুক্ত হয়ে মানবসভ্যতা গড়েছে, তার সম্পদ সৃষ্টি করেছে, আর ব্যক্তিগত মালিকানার জোরে পুঁজিপতিশ্রেণী তা বেচে মুনাফা আত্মসাৎ করেছে। এই নির্জলা সত্যটিকে আড়াল করে পুঁজিপতিশ্রেণীর একদল সেবাদাস বারবার প্রচার করে প্রমাণ করতে চেয়েছে, পুঁজি ও পুঁজিপতিরাই নাকি এই সম্পদ ও সভ্যতার আসল কারিগর। বারবার তারা এই মিথ্যা কথাটা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে নানা প্রচারমাধ্যমের সাহায্যে প্রচার করে করে জনমানসকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছে। কিছুদিন আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ খোদ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে সেখানকার পুঁজিপতিদের এক সভায় বলেছিলেন — ''History has shown that businessmen,

চারের পাতায় দেখুন

৩ জানুয়ারি থেকে দাবি আদায়ে বিদ্যুৎগ্রাহকদের আমরণ অনশন

বিদ্যুতের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে লাঠিগুলির মোকাবিলা করে লড়ছে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা)। আন্দোলনের উচ্চতর স্তরে আগামী ৩ জানুয়ারি অ্যাবেকার নেতৃত্বে বিদ্যুৎগ্রাহকরা আমরণ অনশনের কর্মসূচি নিয়েছেন। ২৭ অক্টোবর সল্টলেকে বিদ্যুৎভবনের সামনে শান্তিপূর্ণভাবে ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য অ্যাবেকার ডাকে গ্রাহক জমায়েতের ওপর সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের বর্বরোচিত লাঠিচার্জ ও গুলিচালনার পর, নিরপেক্ষ তদন্ত, অপরাধী অফিসারদের কঠোর শাস্তি, আহতদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং সর্বস্তরে বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল প্রত্যাহারের দাবিতে অ্যাবেকার এই আমরণ অনশনের ডাক, সংগঠনের দৃঢ় প্রত্যয় প্রমাণিত করেছে।

অ্যাবেকা সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছে — কেন এই অনশন, কী তার যৌক্তিকতা। অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস এবং সভাপতি ভবেশ গাঙ্গুলি প্রচারপত্রে বলেছেন —

বিদ্যুৎ মাশুল স্থির করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। সেই কারণে বিদ্যুতের দাম বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকম। পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ মাশুল ভারতবর্ষের সব রাজ্যের থেকে বেশি থাকা সত্ত্বেও প্রতি বছর তা বেড়ে চলেছে। কারণ পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এর বাণিজ্যিক নীতি ও তথাকথিত পারস্পরিক ভর্তুকি বিলোপনীতি দ্রুততার সাথে এ রাজ্যে প্রয়োগ করে চলেছে। এর ফলে রাজ্যের গরিব মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং ক্ষুদ্র শিল্পের নাভিশ্বাস উঠেছে। এবছর সব থেকে বেশি আক্রান্ত কৃষি গ্রাহকেরা। ১০০ শতাংশ মাশুল বাড়ানো হয়েছে কৃষি গ্রাহকদের। পশ্চিমবঙ্গের আর্থিকভাবে দুর্বল কৃষকদের পক্ষে এই বর্ধিত মাশুল দেওয়া সম্ভব নয়।

ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে বিদ্যুৎ মাশুল, বিশেষত কৃষি বিদ্যুৎ মাশুল এমন অস্বাভাবিক হারে বাড়েনি। তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশের ক্ষুদ্র চাষী বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ পাচ্ছে। পাঞ্জাবে ২৫ পয়সা ইউনিট এবং অন্যান্য বেশিরভাগ রাজ্যে ৫০ পয়সা ইউনিট। আন্দোলনের চাপে দিল্লি ও রাজস্থানে দাম আরো কমেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের জন্য বিদ্যুতের দাম ৩·৫০ টাকা প্রতি ইউনিট।

এই অস্বাভাবিক হারে বর্ধিত কৃষি বিদ্যুৎ মাশুল প্রত্যাহার না করা হলে জানুয়ারি মাসেই দেখা দিতে পারে বিপর্যয়। বোরো চাষীদের হয় চাষ বন্ধ করতে হবে অথবা ক্ষুদ্র কৃষকদের বেশি দামে জল কিনে চাষ করতে গিয়ে ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ে জমি বিক্রি করে দিয়ে পথের ভিখারি হতে হবে, নয়তো আত্মহত্যা করে মুক্তি চাইতে হবে এই মরণ ফাঁদ থেকে। চাষ বন্ধ হলে গ্রামের শ্রমিকরা কাজ হারিয়ে একই পথ নিতে বাধ্য হবে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে দেখা দেবে বিপর্যয়।

আটের পাতায় দেখুন

রোকেয়া সাখাওয়াতের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী পালিত

কলকাতা

সারা বাংলা রোকেয়া ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটির উদ্যোগে ১৪ ডিসেম্বর ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে এক মহতী সমাবেশে মহীয়সী রোকেয়ার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করা হয়। ৯ ডিসেম্বর রোকেয়ার ১২৫তম জন্ম দিবসে রাজ্যের সর্বত্র জেলায় জেলায় বিভিন্ন অনুষ্ঠান, স্কুলে স্কুলে রোকেয়ার প্রতিকৃতি সম্বলিত ব্যাজ পরিধান, পদযাত্রা, পথসভা, আলোচনা সভা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে দিনটি পালিত হয়। বৎসরব্যাপী অনুষ্ঠানের পর ১৪ ডিসেম্বর বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও বিভিন্ন জেলা থেকে আগত রোকেয়া অনুরাগী সুধীজনের অংশগ্রহণে সমগ্র অনুষ্ঠানে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর মাল্যদান অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ডঃ মীরাতুন নাহার, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শুভ্রাংশু চক্রবর্তী ও শরৎচন্দ্র জন্মবার্ষিকী কমিটির সহ সভাপতি চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। বক্তারা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রোকেয়ার জীবন সংগ্রাম, সমাজ সচেতনতা ও নারী আন্দোলনে উজ্জ্বল ভূমিকার কথা তুলে ধরেন, সাথে সাথে আজকের দিনে রোকেয়ার চিন্তার অনস্বীকার্য প্রাসঙ্গিকতার কথাও তাঁরা উল্লেখ করেন।

এর পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বেগম রোকেয়া স্মৃতি রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ গীতি আলেখ্য ও সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের ছাত্রীবৃন্দ নাটক মঞ্চস্থ করে। ডঃ মীরাতুন নাহার, কেশোয়ার জাঁহা ও কামাল হোসেন রোকেয়ার 'পদ্মরাগ' উপন্যাসের অংশ অবলম্বনে শ্রুতিনাটক পরিবেশন করেন। প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত পরিবেশনের পর বেহালা শাখার উদ্যোগে একটি গীতি আলেখ্য পরিবেশিত হয়।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন অনুষ্ঠানের সভানেত্রী ও কমিটির সভানেত্রী রোকেয়া সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা লীনা সেনগুপ্ত। কমিটির পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী স্কুলগুলিকে ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রোকেয়ার ছবি সম্বলিত স্মারক উপহার দেওয়া হয়।

কোচবিহার

১০ ডিসেম্বর কোচবিহার স্টেডিয়াম হলে পালিত হল রোকেয়া সাখাওয়াতের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কোচবিহার নিউটাউন গার্লস স্কুলের শিক্ষিকা রীণা দে। শুরুতে কমিটির যুগ্ম-সম্পাদিকা নাজিরা খন্দকার অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেন, রোকেয়া রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও মুসলিম মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে কঠিন সংগ্রাম করে গেছেন তা আজও আমাদের প্রেরণা দেয়। নজরুলের 'নারী' কবিতাটি পাঠ করেন মমতাজ বেগম, আবৃত্তি করে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী মেহেক সুলতানা আঁখি। লোপামুদ্রা চ্যাটার্জী রোকেয়া রচনাবলী থেকে অংশবিশেষ পাঠ করে শোনান। প্রধান বক্তা ভারতী রায় মহীয়সী রোকেয়ার স্বচ্ছ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং নারীশিক্ষা বিস্তারে তাঁর জীবনের কঠিন সংগ্রামের নানা দিক তুলে ধরেন। বহ্নিশিখা সেনগুপ্তের পরিচালনায় রোকেয়ার উপর রচিত সঙ্গীত সকলকেই মুগ্ধ করে। এ সভায় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় ইন্দিরাদেবী গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা নন্দিতা ঘোষ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অনেকেই আগ্রহের সঙ্গে বেগম রোকেয়া প্রসঙ্গে পুস্তিকা এবং ছবি ক্রয় করেন।

কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর একাংশ

দিনহাটা

দিনহাটা শহরের নৃপেন্দ্র নারায়ণ স্মৃতিপাঠাগারে রোকেয়া ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির আহ্বায়ক আরতি রায় রোকেয়ার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। নারী শিক্ষার বিস্তার এবং অবরোধ প্রথা সম্পর্কে রোকেয়ার সুচিন্তিত বক্তব্য প্রসঙ্গে আলোচনা করেন সান্ত্বনা দত্ত। অনুষ্ঠানে রোকেয়া রচনাবলীর অংশবিশেষ পাঠ করে শোনান মনোয়ারা বেগম। ফিরোজা আমেদ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান।

রোকেয়ার সমাধিস্থল পানিহাটি

পানিহাটিতে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সমাধিস্থলে সংক্ষিপ্ত ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ৯ ডিসেম্বর তাঁর ১২৫তম জন্মদিবস পালিত হয়। তাঁর সমাধিতে মাল্যদান করেন এম এস এসের উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির পক্ষে কমরেড কল্পনা রায়, ব্যারাকপুর মহকুমা শাখার পক্ষে কমরেড সুজাতা রায় এবং 'বেগম রোকেয়া কমিটি'র পক্ষে পানিহাটি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা ইরা চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠানে এম এস এসের ব্যারাকপুর মহকুমা সম্পাদিকা কমরেড রত্না দত্ত বলেন, রোকেয়ার জীবন সংগ্রামকে সামনে রেখে বর্তমানে নারী নির্যাতন-নারী পাচার-বিজ্ঞাপনে অশ্লীল নারীদেহের প্রদর্শনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ ভাবে প্রতিবাদ করতে হবে। এছাড়া বক্তব্য রাখেন ইরা চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে পানিহাটি বালিকা বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষিকাও উপস্থিত ছিলেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

জয়নগর থানার বামনগাছি অঞ্চলে কামারিয়া জুনিয়ার মাদ্রাসায় ১০ ডিসেম্বর কয়েক শত ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের উদ্যোগে রোকেয়া দিবস পালিত হয়। এখানে অন্যান্য স্কুল থেকেও ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত হয়েছিল। তাদের রোকেয়া স্মারক ব্যাজ পরানো হয়। এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মাদ্রাসার দুই শিক্ষক মহিউদ্দিন মোল্লা, মোজাফফরগাজী, মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষে সোফি পৈলান ও 'প্রতিভার সন্ধানে' পত্রিকার সম্পাদক ইউসুফ মোল্লা। তাঁরা রোকেয়ার জীবন সংগ্রামের কাহিনী বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। এতে ছাত্রছাত্রীরা ব্যাপকভাবে উৎসাহিত হয়। রোকেয়া স্মরণে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন পাঁচুগোপাল মণ্ডল।

মুর্শিদাবাদ

১১ ডিসেম্বর বহরমপুর গ্র্যান্ট হলে রোকেয়া স্মরণে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। আয়োজক কমিটির জেলা সম্পাদিকা পূর্ণিমা কর্মকার তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন — বাংলার উনিশ শতকের নবজাগরণের অগ্রদূত রামমোহন, বিদ্যাসাগরের সার্থক উত্তরসূরী ছিলেন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। প্রধান অতিথি অধ্যাপিকা সন্ধিনী রায়চৌধুরী বলেন, শুধু মুসলমান সমাজ নয়, তাঁর চেতনায় সমগ্র নারী সমাজের জাগরণ ও মুক্তির ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে।

গোরাবাজার বেগম রোকেয়া কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের সভানেত্রী হাসিনা বানু বলেন, গ্রামাঞ্চলে আজও গোঁড়ামি ও কূপমণ্ডুকতার আস্ফালন চলছে। তাই রোকেয়ার জীবন ও কর্ম নিয়ে আমাদের চর্চা অবিরত চালিয়ে যেতে হবে। কমিটির সহ-সভানেত্রী কল্যাণী চ্যাটার্জী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। প্রধান বক্তা প্রণতি কর বলেন, আজকের পুঁজিবাদ সমাজকে আবার পিছনের দিকে নিয়ে যেতে চাইছে। তাই পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথেই আজকের পরিস্থিতিতে মহীয়সী রোকেয়ার নারীমুক্তির ভাবনা ও স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব। অনুষ্ঠানে জেলাজুড়ে বর্ষব্যাপী নানা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

দার্জিলিং

৯ ডিসেম্বর শিলিগুড়ি শহরে প্রায় সমস্ত বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষিকারা রোকেয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করেন এবং ছাত্রীরা ব্যাজ পরিধান করে। ১২৫তম রোকেয়া জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটির উদ্যোগে ১৩ ডিসেম্বর সামসী হাই মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা। সভাপতিত্ব করেন ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।

আলোচনা সভায় বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ও সমাজসেবী শঙ্কর গাঙ্গুলি। এছাড়া বক্তব্য রাখেন এ আই এম এস এসের দার্জিলিং জেলা সম্পাদিকা জয়ন্তী ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে নজরুলগীতি ও উর্দুভাষায় দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

পার্টি কর্মীর জীবনাবসান

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার শ্যামনগরের কমরেড রবীন দাস গত ৯ ডিসেম্বর, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। কমরেড রবীন দাস ১৯৬৮ সালে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এস ইউ সি আই দলের সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী অনুমোদিত ইনচেক্ টায়ার ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন-এর কার্যকরী সমিতির সদস্য ছিলেন। কমরেড দাস ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর সদ্যসমাপ্ত ১৯তম রাজ্য সম্মেলনে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। শারীরিক অসুবিধা সত্ত্বেও সম্মেলনের তিন দিন তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কমরেডরা তাঁর বাসভবনে যান। সেখানে পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সদানন্দ বাগল প্রয়াত রবীন দাসের মরদেহে মাল্যার্পণ করেন।

কমরেড রবীন দাস লাল সেলাম

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

সেতু নির্মাণের দাবিতে আন্দোলন

বুদকুলা খেয়া ঘাটের কাছে পিয়ালী নদীর ওপর সেতু না থাকায় জয়নগর, ক্যানিং, বাসন্তী ও গোসাবা থানা সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ চরম দুরবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। জরুরি প্রয়োজনে যোগাযোগের জন্য যানবাহন চলাচলের উপযুক্ত সেতু নির্মাণ একান্ত দরকার।

এই সমস্যা সমাধানের দাবিতে গত ১৮ নভেম্বর খেয়াঘাট সংলগ্ন স্থানে এক নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কাসেম মণ্ডল। বক্তব্য রাখেন ওয়াজেদ গাজী, আক্তারুল হালদার, মোয়াজ্জেম আখন্দ, আবুল কালাম হালদার, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, ইয়াহিয়া আখন্দ প্রমুখ। সেতু নির্মাণের দাবিতে আন্দোলন পরিচালনার জন্য ঐ কনভেনশন থেকে একটি নাগরিক কমিটি গঠিত হয় — সভাপতি এবং সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল ও আতিয়ার গাজী।

কোচবিহার স্টেডিয়াম হলে বক্তব্য রাখছেন ভারতী রায়

বহরমপুর গ্রান্ট হলে বক্তব্য রাখছেন প্রণতি কর

পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের বিকল্পের কথা ভাবতে হবে

একের পাতার পর

এসে গেল, অমনি বিজেপি জানিয়ে দিয়েছে যে, তারা ভলকার ইস্যুতে আর হৈ চৈ করবে না। তাহলে কি 'দাগি সাংসদ' কাণ্ডটি কংগ্রেসের একটি পাল্টা চাপ, বিজেপি'র চাপ থামানোর জন্য?

আবার, সংবাদমাধ্যম দাগি সাংসদদের দুর্নীতি ফাঁস করে দেওয়ায় যাঁরা সংবাদমাধ্যমের ইতিবাচক দিকের প্রশংসা করছেন এবং এটাকে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের জয় বলে চিহ্নিত করছেন, তাঁরা কি জানেন যে, এর পিছনেও থাকে পুঁজিপতিগোষ্ঠীর লবি? ধরা-পড়া সাংসদরা যেসব গোষ্ঠীর এজেন্টের ভূমিকায় কাজ করতেন, তার বিরোধী গোষ্ঠী এঁদের ধরিয়ে দেবার সুপরিকল্পিত আয়োজন করেছিল কিনা — সে বিষয়ে তাঁরা কি কিছু জোর দিয়ে বলতে পারেন?

তাছাড়া সংবাদমাধ্যম তো এখন একটি লাভজনক ব্যবসা। চমকপ্রদ সংবাদপ্রকাশ করে নিজস্ব টিভি চ্যানেল ও সংবাদপত্রের বাজার চাঙ্গা করে তোলাই লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে তহলকা গোষ্ঠী এবং আজতক চ্যানেল যে দারুণ সফল — সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এছাড়াও, আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মানি কিংবা ফ্রান্সের নানা কোম্পানিকে বিশেষ বরাত পাইয়ে দেবার খেলাও চলে। সেনাবাহিনীর কামান, অন্যান্য অস্ত্র, পোষাক, কফিন ইত্যাদির অর্ডার লাভের পিছনেও থাকে অদৃশ্য সুতোর টান। এসব খেলা লোকসভা-রাজ্যসভাতেই শুধু নয়, রাজ্যে রাজ্যে বিধানসভাগুলিতেও সমানভাবে চলে। কালো টাকার অদৃশ্য কেরামতি এসব।

সিপিএমের এম পি-রা কি এসব থেকে মুক্ত? একথা ঠিক যে, ধরাপড়া ১১ জন সাংসদের মধ্যে সিপিএমের কোনও এম পি নেই। সেটা দেখিয়ে সিপিএম জয়ঢাক পেটাচ্ছে এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের মর্যাদা নষ্ট হচ্ছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করছে। কিন্তু গত ২৮ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন সিপিএম পার্টিটিকে এ রাজ্যের মানুষ তো খুব ভাল করে চিনে নিয়েছে। রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে ঠিকাদার প্রমোটার ইত্যাদির সঙ্গে সিপিএম নেতাদের ঘনিষ্ঠ চক্র এবং গোয়েঙ্কা, ডালমিয়া সহ বিভিন্ন শিল্পপতি, চটকল মালিক, চা-বাগান মালিকদের সঙ্গে রাজ্যের সিপিএম মন্ত্রীদের দহরম-মহরম — এসবই আমাদের জানা। গোয়েঙ্কার বিদ্যুৎ সংস্থা সি ই এস সি-র জোচ্চুরির প্রতিবাদ করায় বিদ্যুৎমন্ত্রী শঙ্কর সেনকে মন্ত্রীসভা থেকে সরিয়ে দিয়েছিল সিপিএম। কসবাস্থিত রাজ্য সরকারের দুটো গ্যাস টারবাইন জ্যোতিবাবুর সিপিএম সরকার বিনামূল্যেই উপহার দিয়েছিল গোয়েঙ্কাকে। বানতলায় জমি থেকে কৃষক উচ্ছেদ করে সেই জমি জলের দরে ডালমিয়াকে পাইয়ে দিয়েছিল সিপিএম সরকার, চর্মনগরী বানাবার জন্য। দীর্ঘকাল চর্মনগরী না গড়ে সেসব ফেলে রেখে দেয় ডালমিয়া। এখন সিপিএম সরকারই ডালমিয়াকে অনুমতি দিচ্ছে ঐ জমির একটা অংশ বাজার দরে অর্থাৎ চড়া দামে বেচে মুনাফা করবার জন্য। এগুলোর পিছনে কীসের খেলা? বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে সিপিএম যখন গত বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ করল, তখন শিল্পপতি গোয়েঙ্কা ও ব্যবসায়ী নেওটিয়া স্বয়ং সিপিএম দপ্তরে গিয়ে ২২ হাজার টাকা দামের ফুলের মালা দিয়ে সিপিএম নেতাদের অভিনন্দন জানিয়ে এসেছিলেন কেন? শিল্পপতি মুকেশ অম্বানি দিল্লিতে কেন ছুটে যান প্রকাশ কারাতের সঙ্গে গোপন বৈঠকের জন্য? কী হয় সেখানে? কোথা থেকে আসে পশ্চিমবঙ্গ সহ রাজধানী দিল্লীতে সিপিএমের রাজার হালে চালচলনের বিপুল অর্থ? কারা এসব জোগায়? স্বাধীন ভারতে পার্লামেন্টকে ঘিরে দুর্নীতির বহু ঘটনার পর একথা আজ আর বলা যায় না যে, এগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা, কিছু বাজে লোক বা বিশেষ একটা দলই এর জন্য দায়ী। দুর্নীতি ও আর্থিক কেলেঙ্কারি যখন প্রায় সকল পার্লামেন্টারি রাজনৈতিক দলকেই গ্রাস করে, তখন তার শিকড় নিশ্চয়ই পার্লামেন্টারি ব্যবস্থাটার মধ্যেই কোথাও থাকবে। বিষয়টা আরও স্পষ্ট হয় যখন বিশ্বের প্রায় সকল পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের দেশে দুর্নীতির প্রায় একই ছবি দেখা যায়। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপরকাঠামো হচ্ছে পার্লামেন্ট। তাই দুর্নীতির শিকড় পার্লামেন্টারি কাঠামোর মধ্যে নয়, পাওয়া যাবে ঐ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে। শুধু ভারতবর্ষ নয়, পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী প্রতিটি রাষ্ট্রেরই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এখন আর্থিক দুর্নীতি। জাপানে এই অভিযোগে একের পর এক প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন, তবু দুর্নীতি রদ হল কোথায়! আমেরিকা-ফ্রান্স সহ সর্বত্র এই দুর্নীতির রমরমা। ব্রিটেনে এই আর্থিক দুর্নীতি বন্ধে আইন প্রণয়ন করতে হচ্ছে, যদিও এই আইনও হবে 'ভস্মে ঘি ঢালার' সামিল।

পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র জন্ম থেকেই কিন্তু দুর্নীতিগ্রস্ত ছিল না। পুঁজিবাদের যখন যৌবন, পার্লামেন্টারি ব্যবস্থাও তখন গণতন্ত্রের প্রসার ঘটাতে উদ্যোগী হয়েছিল। কিন্তু পুঁজিবাদ যখন মুনাফার লালসায় ছুটতে ছুটতে সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করল, মালিকশ্রেণীর নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা যখন তীব্র থেকে তীব্রতর হল — নিকৃষ্ট স্তরে পৌঁছল, তখন পুঁজিবাদ ফেলে দিল গণতন্ত্রের মহান ঝাণ্ডা। শুধু তাই নয়, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক অধিকারগুলোও একচেটে পুঁজিপতিদের কাছে বাধা হয়ে দেখা দিল। ফলে পুঁজিবাদের তখন ধর্ম হয়ে দাঁড়াল — জনগণের গণতান্ত্রিক মনন ধ্বংস করো, গণতান্ত্রিক চেতনা-আদর্শ-মূল্যবোধ ধ্বংস করো, সবাইকে পুঁজিবাদী বাজারের লুণ্ঠনযোগ্য পণ্যে পরিণত করো, অর্থপিপাসায় সবাইকে মত্ত করে তোলো। মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোতে ১৫৭ বছর আগে ১৮৪৮ সালে পুঁজিবাদের চরিত্র উদ্‌ঘাটিত করে দেখিয়েছিলেন, "মানুষের সঙ্গে মানুষের নগ্ন স্বার্থের সম্পর্ক ও নির্বিকার নগদ লেনদেনের বন্ধন ছাড়া আর কিছুই এরা বাকি রাখেনি। ... লোকের ব্যক্তিমূল্যকে এরা পরিণত করেছে বিনিময় মূল্যে ; অগণিত অনস্বীকার্য সনদবদ্ধ স্বাধীনতার স্থানে এরা এনে খাড়া করল ওই একটিমাত্র স্বাধীনতা — অবাধ বাণিজ্য, যাতে বিবেকের স্থান নেই। এক কথায়, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিভ্রমে যে শোষণ এতদিন অবগুণ্ঠিত ছিল, তার বদলে এরা এনেছে নগ্ন, নির্লজ্জ, প্রত্যক্ষ, পাশবিক শোষণ।

"মানুষের যেসব বৃত্তিকে লোকে এতদিন সম্মান করে এসেছে, সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের চোখে দেখেছে, বুর্জোয়াশ্রেণী তাদের মাহাত্ম্য ঘুচিয়ে দিয়েছে। চিকিৎসাবিদ, আইনবিশারদ, পুরোহিত, কবি, বিজ্ঞানী — সকলকে এরা পরিণত করেছে তাদের মজুরিভোগী শ্রমজীবীরূপে।"

এরই পরিণতিতে সমাজ পরিণত হয়েছে প্রাণহীন দেহে — মৃতদেহে। বাড়ছে পচন। যত দিন যাচ্ছে, পচন ছড়াচ্ছে দ্রুতগতিতে। ন্যায়-নীতি-মূল্যবোধের ধারণা অর্থলিপ্সার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভিন্ন রূপ নিয়েছে। 'শ্রেষ্ঠ সমাজবন্ধু' শিক্ষক ও ডাক্তার বলছেন, 'পড়ার জন্য এত খরচ করলাম, এবার টাকা কামিয়ে নেব না!' জনপ্রতিনিধি এম এল এ, এম পি-রা বিপুল অর্থ ব্যয় করে ভোটে জিতে বলছেন, 'জিতে গিয়েছি, এখন টাকাটা সুদে-আসলে তুলে নেব না!' বিহার বিধানসভা নির্বাচনের পর গতবার যখন ত্রিশঙ্কু পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, কেউই বা কোনও জোটই সরকার গড়তে পারছিল না, তখন রামবিলাস পাশোয়ানের অনুগামী এম এল এ-রা বিজেপি শিবিরের দিকে ঝুঁকে পড়ার পিছনে যুক্তি দিয়েছিলেন যে, 'এত টাকা খরচ করে জিতলাম, এখন সরকারে বসতে না পারলে টাকাগুলো তুলবো কেমন করে?' কী চূড়ান্ত নির্লজ্জতা! এঁদের মধ্যে লজ্জাশরম বোধটাই নেই। এবার যে ১১ জন এম পি আর্থিক দুর্নীতিতে দাগি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছেন, তাঁদের একজন তো ক্যামেরার সামনে বলেই দিলেন, 'ভোটে জিততে দেড়-দু'কোটি খরচ করতে হয়েছে ; সেই খরচ যাঁরা জুগিয়েছেন, তাঁরা তো বিনিময়ে তার বেশি আদায় করবেনই। অসৎ না হয়ে উপায় কী?' অর্থাৎ শিল্পপতি-পুঁজিপতি-ব্যবসাদাররাই যে তাঁদের জেতাতে টাকা ঢালে এবং তার উদ্দেশ্যই হল ওই এম পি'র সহায়তায় সরকারকে প্রভাবিত করে সুবিধা আদায়, অন্য শিল্পগোষ্ঠীকে হটিয়ে বেশি মুনাফা কামানো — এই সত্য মহাত্মা এম পি জলের মতো স্পষ্ট করে বলে দিলেন।

কেবল এদেশে নয়, বিশ্বের সকল পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রেই এসবের রমরমা। সরকার এখন আর 'জনগণের জন্য, জনগণের ও জনগণের দ্বারা' হয় না। সরকার এখন পুঁজিপতিদের জন্য, পুঁজিপতিদের ও পুঁজিপতিদের দ্বারা। তারাই টাকা ঢালে, প্রচারমাধ্যমে প্রচার চালায় — জনমতকে বিশেষ খাতে প্রবাহিত করে নিয়ে যায়। গণতন্ত্রের নামে পশ্চিমী দুনিয়ার দেশে দেশে জনপ্রতিনিধিরা সরাসরি কোনও বিশেষ শিল্পগোষ্ঠীর প্রতি সমর্থন জানান, কোনও লজ্জা বা সঙ্কোচের বালাই নেই। এই নির্লজ্জতার নামই সেখানে স্বচ্ছতা। ইউরোপ ও আমেরিকায় রাজনৈতিক দলের খোলাখুলি পৃষ্ঠপোষকতা করেন প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি-পুঁজিপতিরা ; ঢাক-ঢাক-গুড়গুড়ের কোনও ব্যাপার নেই। এই পশ্চিমী রীতির পক্ষে সওয়াল করে এদেশের কোনও কোনও কাগজ-লিখিয়ে বলছেন — এটা হলেই নাকি আর্থিক দুর্নীতি দূর হবে। অথচ পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলিতে কিন্তু এরপরও মন্ত্রী-সাংসদদের দুর্নীতি রমরমিয়ে চলছে। আবার কেউ লিখছেন, নির্বাচনে লড়বার খরচ যদি রাষ্ট্র বহন করে তাহলে নাকি এই দুর্নীতি রদ করা সম্ভব। এ যেন শিরে দংশাইলে সর্প, হাতে বাঁধে তাগা। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বহাল থাকবে, মুনাফা লালসা বাড়তেই থাকবে, পুঁজিপতিশ্রেণী পারস্পরিক দ্বন্দ্বে জয়লাভের জন্য দুর্নীতির জাল বিস্তার করে যাবে, গণতান্ত্রিক ন্যায়নীতি ও মূল্যবোধকে ধ্বংস করবে, অথচ পার্লামেন্টারি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ন্যায়ের আলয় হয়ে থাকবে, বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি দলগুলো আর্থিক দুর্নীতির পাঁকে ডুববে না, তাদের পচন বাড়বে না — এ হল অলীক কল্পনা। এ কখনও হতে পারে না।

মনে রাখতে হবে, মহান গণতন্ত্রের যে ঝাণ্ডা পুঁজিবাদ মাটিতে ফেলে পদপিষ্ট করেছে, তাকে সযত্নে কাঁধে তুলে নিয়ে আরও সামনে এগিয়েছে সমাজতন্ত্র। সেখানে মুনাফা লালসা নেই, তাই তার ফাঁদে গণতন্ত্র বন্দী হওয়ার উপায়ই ছিল না। জনগণের সর্বনিম্ন স্তর থেকে মতামত সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতে রচিত হত রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা। সেই পরিকল্পনা রূপায়ণের অঙ্গীকার নিয়ে নির্বাচিত হতেন জনপ্রতিনিধিরা ; তাঁরা অঙ্গীকার পূরণে ব্যর্থ হলে তাঁদেরকে জনপ্রতিনিধি পদ থেকে ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা জনগণকে দেওয়া হয়েছিল। কোনও পুঁজিবাদী রাষ্ট্র জনগণের এহেন অধিকারের কথা ভাবতেই পারে না। পুঁজিপতিগোষ্ঠীর চাপ কিংবা প্রলোভনের কোনও অস্তিত্বই সেখানে নেই। তাই সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদী দুনিয়ার কাছে আতঙ্কের। তাই সোভিয়েট সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করবার জন্য পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি সম্মিলিতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সমাজতন্ত্র শুধু অর্থনীতি ক্ষেত্রে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল তাই নয়, সমাজতান্ত্রিক ন্যায়-নীতিবোধ, মূল্যবোধে উদ্বেলিত করে তুলেছিল মানুষকে। নতুন যুগের নতুন মানুষ সৃষ্টি করেছিল সমাজতন্ত্র। সোভিয়েট সমাজতন্ত্রের যখন শৈশব তখনই তার স্বরূপ দেখে রবীন্দ্রনাথ বিস্মিত হয়ে লিখেছিলেন, 'আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ তীর্থদর্শন' ; বিজ্ঞানী আইনস্টাইন লিখেছিলেন, 'সমাজতন্ত্র একটি সামাজিক ও নৈতিক পূর্ণতার পথনির্দেশ করে।'

ফলে সমাজতন্ত্র চাই। পচা-গলা পুঁজিবাদের ধ্বংসসাধনের পথেই আসবে সেই সমাজতন্ত্র। যথার্থ গণতন্ত্রের, যথার্থ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিজয়পতাকা ওড়াতে পারে সমাজতন্ত্রই। যথার্থ বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতেই এগুতে হবে সমাজতন্ত্রের দিকে। এই পথেই গড়ে উঠবে দুর্নীতিমুক্ত বিপ্লবী চরিত্রের ও নতুন সমাজের বনিয়াদ। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের মহান চিন্তাধারার আলোকে এদেশে এস ইউ সি আই সেই অভিযানে নেতৃত্ব দিচ্ছে।

রামপুরহাটে ডি এস ও কর্মী ক্ষুরের আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত

গত ১০ অক্টোবর সন্ধ্যায় ডি এস ও কর্মী আবিদ হাসান (বাপ্পা) যখন সাইকেল চেপে ছাত্রসংসদ নির্বাচনের নমিনেশন পেপার নিয়ে আরেকজন কর্মীর বাড়ি যাচ্ছিলেন, তখন লোডশেডিং-এর মধ্যে জনবিরল রাস্তায় মোটর সাইকেল চেপে তিন দুষ্কৃতী মুখে মাফলার বেঁধে তাঁর কাছ থেকেওই নমিনেশন পেপার কেড়ে নিতে চায়। তিনি বাধা দিলে তারা তাঁকে অমানুষিকভাবে মারধর করে এবং ক্ষুর চালিয়ে তাঁকে গুরুতর আহত করে। এরপর আবিদের কাছ থেকে নমিনেশন পেপার ছিনিয়ে নিয়ে তাঁকে রক্তাপ্লুত অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যায়। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। কলেজ নির্বাচন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই সংসদে ক্ষমতাসীন এস এফ আই, ডি এস ও-র কর্মীদের হুমকি দিতে থাকে। তার ধারাবাহিকতায় এই ঘটনা। ওই রাতেই থানায় এফ আই আর করা হয়। প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় দোষীদের গ্রেপ্তার, শাস্তি, তদন্ত ও কলেজে শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশে নির্বাচনের দাবিতে ১২ ডিসেম্বর স্কোয়াড করে কলেজ গেট এবং থানা, এস ডি ও অফিস গেটে সভা করে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হলে এবং ডি এস ও-র প্রচারে ঘটনা জেনে শহরের মানুষ আক্রমণকারীদের ধিক্কার জানাতে থাকেন। ডেপুটেশন দিতে গেলে অধ্যক্ষ ঘটনা বাইরে ঘটেছে বলে দায়িত্ব এড়িয়ে যান। থানা এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করেনি।

এতদসত্ত্বেও কলেজে ডি এস ও একুশটি আসনে প্রার্থী দেয়। নানা অছিলায় পনেরটি প্রার্থীপদ বাতিল করলেও ছয়টি আসনে লড়া হচ্ছে। এস এফ আই হামলাকারীরা ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। কলেজের ছাত্রনেত্রী যূথিকা ধীবর এবং জেলা সম্পাদিকা আয়েষা খাতুন ঘটনার প্রতিবাদে বিভিন্ন সভায় বলেন, সমস্ত আক্রমণ মোকাবিলা করে ডি এস ও লড়বে। ফি বৃদ্ধি-সেল্ফ ফিনান্সিং কোর্স চালু-বেসরকারীকরণের প্রতিবাদে একমাত্র ডি এস ও-ই আন্দোলন করছে বলে এই আক্রমণ। বোলপুর-মুরারই কলেজেও আক্রমণ ও হুমকি চলছে। কৃষি-শিক্ষা-স্বাস্থ্য ধ্বংসকারী 'গ্যাটস্'-এর হংকং সম্মেলনের প্রতিবাদে সারা ভারত প্রতিবাদ দিবসে রামপুরহাট কলেজ গেটে চুক্তির প্রতিলিপি পোড়ানো হয় এবং শহরে মিছিল হয়।

পুঁজি বিনিয়োগ হলেই শ্রমিকের জীবনমান উন্নত হয় না

একের পাতার পর

including those who work in the field of finance, are the ultimate custodian of possibilities of civilization''। এর পরেই তিনি তাদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে বলেছিলেন, ''I therefore salute you and institution that you represent for the active role you are playing in the process of wealth creation and in ensuring that the fruits of this development reach out to more and more people''. (ইকনমিক টাইমস, ২৪-৯-০৫) (ইতিহাস থেকে আমরা দেখতে পাই যে, পুঁজিপতি বা ব্যবসাদাররাই শেষপর্যন্ত সভ্যতার সকলরকম সম্ভাবনার রক্ষক। তাই আপনারা যারা এই সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন এবং এর ফসল জনগণের কাছে আরও বেশি করে পৌঁছে দেওয়া সুনিশ্চিত করেছেন, তাদের উদ্দেশে আমি আমার প্রণতি জানাই)। এভাবেই পুঁজি ও পুঁজিপতিদের প্রতিনিধি বা সেবাদাসরা পুঁজির এধরনের নির্লজ্জ বন্দনা করে থাকে। আর বর্তমানে সিপিএম নেতৃত্ব একইভাবে পুঁজি ও পুঁজিবাদের বন্দনা করছে। কারণ বুঝতে অসুবিধা হয় না। আজ তারা কেন্দ্রে কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ সরকারের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত সঙ্গী এবং এরাজ্যেও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের প্রধান স্বার্থবাহক। তাই তাদের আজ বুর্জোয়া নেতাদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে পুঁজির বন্দনা করতে হচ্ছে। আর এই ভাবনার বিরোধিতা করে ইতিহাসের মহত্তম শিক্ষক কার্ল মার্কস ইতিহাসে পুঁজির ভূমিকার যথার্থ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে পুঁজির শ্রেণীচরিত্র ও তার শোষণমূলক অবস্থানকে তুলে ধরেছিলেন। তিনি পুঁজিকে কোনও অর্থভাণ্ডার অথবা বস্তু অথবা উৎপাদনের উপকরণ হিসাবে চিহ্নিত করেননি। এমনকী বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের মতো পুঁজিকে উৎপাদনের চারটি উপকরণের (জমি, শ্রম, পুঁজি, পরিচালক) একটি — এভাবেও চিহ্নিত করেননি। তিনি তাঁর প্রজ্ঞাদীপ্ত বিশ্লেষণের সাহায্যে বুর্জোয়াদের এই মতবাদ খণ্ডন করে প্রমাণ করেছিলেন যে, ইতিহাসে সমাজগঠনের একটি বিশেষ স্তরে ও প্রক্রিয়ায় একটি বিশেষ সামাজিক সম্পর্কের উপাদান হিসাবে পুঁজি সৃষ্টি হয়েছিল। তাই ঐ বিশেষ সম্পর্ককে বাদ দিয়ে পুঁজিকে বোঝা যাবে না। বরং এটা বলাই সঠিক যে, একটি বিশেষ ঐতিহাসিক সামাজিক প্রক্রিয়ায় বিশেষ বস্তু বা অর্থভাণ্ডার পুঁজির রূপ নিয়েছে এবং একটি সামাজিক সম্পর্ক বা চরিত্র অর্জন করেছে। তিনি আরও দেখিয়েছিলেন যে, এই পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের দ্বারা সমাজের এক শ্রেণী উৎপাদনের উপর তাদের একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করে এবং শ্রমজীবী জনগণের শ্রমশক্তিকে পণ্যে পরিণত করে। শ্রমিক যে শ্রম দেয় তার সাথে তাদের জীবনধারণের মানোন্নয়নের কোন সম্পর্ক তো নেই-ই বরং তার উল্টোটাই হয় এবং এভাবেই শ্রমিকশ্রেণী পুঁজির একটি বিরোধাত্মক শক্তি হিসাবে গড়ে উঠেছে। ''However, capital is not a thing but rather a definite social production relation, belonging to definite historical formation of society, which is manifested in a thing and lends this thing a specific social character …it is the means of production monopolised by certain section of society, confronting living labour power as products and working condition rendered independent of this very labour power, which are personified through this antithesis in capital''. – K. Marx, Capital vol III Chapter XLVIII. মার্কসের এই বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ থেকে আমরা পাই যে, পুঁজি মানে হল একটি সামাজিক সম্পর্ক। সে সম্পর্ক হল পুঁজিপতিশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর বিরোধাত্মক সম্পর্ক। দ্বিতীয়ত, পুঁজির বিনিয়োগ শ্রমিকশ্রেণীর জীবনের মানোন্নয়ন ঘটায় না। বরং উৎপাদনের উপর পুঁজিপতিশ্রেণীর একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তা শ্রমিকশ্রেণীর জীবনে শোষণ অত্যাচার ও দুর্দশা নামিয়ে আনে। এই শোষণ বা অত্যাচার কীভাবে হয় তা নানাভাবে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন এবং বিজ্ঞান হিসাবে সূত্রাকারে তা তুলে ধরেছেন। তিনি সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে তুলনা করে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা কীভাবে ভিন্ন উৎপাদন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছে তা দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন — সামন্ততন্ত্রে উৎপাদন ও বণ্টনের সূত্র হল C-M-C অর্থাৎ পণ্য - অর্থ - পণ্য। এই ব্যবস্থায় অর্থ কিন্তু পুঁজি নয়, অর্থ এখানে বিনিময়ের মাধ্যম, অর্থাৎ কেনাবেচার মাধ্যম। আর পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অর্থ কীভাবে পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়ে একটি নতুন সামাজিক সম্পর্ককে সূচিত করেছে মার্কস সূত্রাকারে তা দেখিয়েছিলেন এভাবে — M-C-M^1, অর্থ - পণ্য - বাড়তি অর্থ। এখানে অর্থ পুঁজি হিসাবে বিনিয়োগ করা হয়েছে এবং উৎপাদিত পণ্য বেচে বাড়তি অর্থ এসেছে। আর এই বাড়তি অর্থ আসা সম্ভব হয়েছে বাড়তি উৎপাদনের ফলে। আবার এই বাড়তি উৎপাদন (surplus product) সম্ভব হয়েছে শ্রমশক্তির বিশেষ একটা বৈশিষ্ট্যের কারণে। মার্কস দেখিয়েছেন — শ্রমশক্তির অদ্ভুত ক্ষমতা হল খাটার জন্য শ্রমিকদের বেঁচে থাকার যা খরচ তার থেকে অর্থাৎ উৎপাদনের ব্যয়ের থেকে শ্রমশক্তি বেশি উৎপাদন করতে পারে। বেঁচে থাকার মতো মজুরি কতটা হবে তা বিশেষ দেশের অবস্থা, রীতিনীতি এবং বহুলাংশে শ্রমিক আন্দোলনের শক্তির উপর নির্ভর করে। কিন্তু শ্রমিক লড়ালড়ি করে যতই বেশি আদায় করুক, তার শ্রমশক্তির উৎপাদনের মূল্য মজুরি থেকে সর্বদাই বেশি হয়। মালিক তাকে বেঁচে থাকার মতো মজুরি দিয়ে বাড়তি উৎপাদনটা আত্মসাৎ করে মুনাফা হিসাবে। এই বাড়তি উৎপাদনের মূল্যের একটা বড় অংশই আবার স্থির পুঁজি হিসাবে বিনিয়োজিত হয়। স্থির পুঁজির ক্রমবৃদ্ধি ঘটে শ্রমিকদের ক্রমাগত বঞ্চনা করে, তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে। বাড়তি পুঁজি বিনিয়োগ করায় শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়লে বাজার যদি না বাড়ে তবে মালিক ছাঁটাই করে। এককথায় পুঁজির বিনিয়োগ, পুঁজির বিকাশের অর্থ হল শ্রমিকদের হাহাকার ও বঞ্চনা, সব হারানোর ইতিহাস। পরবর্তীকালে মার্কসবাদের মহান শিক্ষক কমরেড লেনিন দেখিয়েছেন কীভাবে শিল্পপুঁজি লগ্নিপুঁজির জন্ম দেয়। এই লগ্নিপুঁজির অপর নাম সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি। পুঁজির বিকাশের পথেই সাম্রাজ্যবাদ একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। মার্কসবাদের এই সব বুনিয়াদী শিক্ষার কোন তোয়াক্কা না করে অনিল বিশ্বাস, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যরা বলছেন, ''পুঁজির কোন রঙ নেই।'' নিজেদের সুবিধামতো মার্কসবাদের ভাণ্ডারে সিপিএম নেতৃত্ব প্রায়শ এ ধরনের 'নতুন নতুন সংযোজন' করে যাচ্ছেন। বর্তমানে তাঁদের এই শ্রেণীচরিত্রবিহীন পুঁজির ব্যাখ্যা শুনে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিপতিগোষ্ঠী অত্যন্ত পুলকিত হবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

এর আগে রাজ্যের শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রী নিরুপম সেন এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, তাঁরা একদিকে যেমন রাজনৈতিকভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করবেন, অপরদিকে বিদেশি পুঁজির আগমন সবসময়েই তাঁদের কাছে স্বাগত। এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি আরও বলেছিলেন যে, তাঁরা অর্থনীতির সাথে রাজনীতিকে জড়াতে চান না। সম্প্রতি সালিম গোষ্ঠীকে চাষের জমি দেওয়া প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী এক জনসভায় বলেছেন, কতটা যাচ্ছে আর কতটা আসছে, তা বিচার করতে হবে, অন্য কিছু নয়। অর্থাৎ কতটা জমি সালেম গোষ্ঠীকে দেওয়া হচ্ছে, তার বিনিময়ে তারা কতটা বিনিয়োগ করছে — এটাই বিচার্য, অন্য কিছু নয়। এসব বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তাঁরা জনগণের কাছে কী বার্তা পৌঁছে দিতে চাইছেন, তা গণআন্দোলন তথা বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মীদের অবশ্যই অনুধাবনযোগ্য।

প্রথমত, তাঁরা 'উন্নয়নে'র দোহাই দিয়ে পুঁজির শ্রেণীউদ্দেশ্য ও চরিত্রকে আড়াল করে যেভাবেই হোক বিনিয়োগ করার পক্ষে ওকালতি করছেন। অর্থাৎ এর দ্বারা বর্তমানে চরম সঙ্কটগ্রস্ত যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মানুষের বিকাশের সমস্ত পথ রুদ্ধ করে জনজীবনে চরম বিপর্যয় ডেকে এনেছে, যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মানুষকে সংগঠিত করা অত্যন্ত জরুরি, সেই পুঁজিবাদ সম্পর্কেই তাঁরা মোহ সৃষ্টি করে চলেছেন।

দ্বিতীয়ত, এই উদ্দেশ্যে সরকারি প্রচেষ্টার পরিবর্তে তাঁরা বেসরকারি এমনকী বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির দ্বারস্থ হওয়ারও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

তৃতীয়ত, পুঁজি বিনিয়োগের পথ সুগম করার জন্য তাঁরা জনগণ তথা শ্রমিকশ্রেণীর সমস্ত অর্জিত অধিকার কেড়ে নিতেও দ্বিধা করছেন না।

চতুর্থত, এ সবকিছুর একটা আদর্শগত যৌক্তিকতা প্রমাণ করার জন্য রঙবিহীন পুঁজি বা শ্রেণীচরিত্রবিহীন পুঁজির একটি আষাঢ়ে গল্প তৈরি করছেন; যা কেবল মিথ্যাই নয়, জনগণকে বুর্জোয়া স্বার্থের হাড়িকাঠে বলি দেবার নামান্তর মাত্র।

লগ্নিপুঁজি সাম্রাজ্যবাদের অপর নাম

কমরেড লেনিন বহু আগেই দেখিয়েছেন যে, বিশ শতকের পুঁজিবাদ একটা নতুন স্তরে প্রবেশ করেছে — তার নাম সাম্রাজ্যবাদ। সাম্রাজ্যবাদ লগ্নিপুঁজির সাহায্যে বিভিন্ন দেশে তার পুঁজির সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। পুরনো বিকাশশীল পুঁজিবাদের সাথে সাম্রাজ্যবাদের তুলনা করে তিনি বলেছিলেন, ''Typical of old capitalism, when free competition held undivided sway, was the export of goods. Typical of the latest stage of capitalism, when monopolies rule, is the export of capital''. (Imperialism, the highest stage of capitalism) অর্থাৎ পুরাতন পুঁজিবাদের আদর্শ বৈশিষ্ট্য ছিল একদিকে অবাধ প্রতিযোগিতা, অপরদিকে পণ্যের রপ্তানি চালু রাখা। আর পুঁজিবাদের এই অন্তিম পর্যায়ে যখন একচেটিয়া পুঁজির আধিপত্য কায়েম হয়েছে তখনকার আদর্শ বৈশিষ্ট্য হল পুঁজি রপ্তানি করা। পুঁজিবাদের এই বিশেষ অবস্থাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কমরেড লেনিন আরও দেখিয়েছেন ঃ (১) এই অবস্থায় পুঁজির এমন কেন্দ্রীভবন হয় যে তা একচেটিয়া পুঁজির জন্ম দেয়, (২) ব্যাঙ্কপুঁজি ও শিল্পপুঁজির মিলনের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় লগ্নিপুঁজি এবং এক ধনকুবের গোষ্ঠী, (৩) পণ্য রপ্তানির পরিবর্তে পুঁজি রপ্তানি পুঁজিবাদের প্রধান চরিত্র হয়ে ওঠে, (৪) সাম্রাজ্যবাদীদের একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে ওঠে যার উদ্দেশ্য গোটা দুনিয়াকে লুণ্ঠনের মৃগয়াক্ষেত্র হিসাবে ভাগ করে নেওয়া এবং (৫) বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি দুনিয়াকে নিজেদের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করে নেয়। এই ভাগ বাঁটোয়ারা যখন শান্তিপূর্ণভাবে হয় না তখনই সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এটাই লেনিনবাদের শিক্ষা। তাই সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির বিস্তার বা দেশে দেশে লগ্নিপুঁজির বিনিয়োগ বা বিস্তারের সাথে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। এইভাবেই দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানে ইরাক সহ বিশ্বের যে সমস্ত দেশে সাম্রাজ্যবাদী নগ্ন হস্তক্ষেপ চলছে এবং তজ্জনিত ধ্বংসলীলা চলছে তা একান্তভাবে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির একাধিপত্য কায়েম করার জন্য, একথা কি অনিল বিশ্বাসরা অস্বীকার করতে পারবেন?

ফলে কোন দেশে লগ্নিপুঁজির আবাহনের অর্থ সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির লুণ্ঠনের জন্য নিজ দেশের বাজার উন্মুক্ত করে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। মনে রাখতে হবে যে, বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর গোটা বিশ্বই আজ বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী বা লগ্নিপুঁজির মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বা ডব্লিউটিও গড়ে উঠেছে, তা কার্যত সাম্রাজ্যবাদী লগ্নিপুঁজির স্বার্থরক্ষার প্রধান হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি কথা মনে রাখতে হবে। লগ্নিপুঁজি বা সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসে, যা পুঁজিবাদের অবাধ বিকাশের যুগের অর্থনীতিতে বিদ্যমান ছিল না। সেগুলি হল ঃ (১) লগ্নিপুঁজি যখন অর্থনীতির মূল নিয়ামক শক্তি হয় তখন সে তার প্রয়োজনীয় উপরকাঠামো বা সংস্কৃতিও দেশের অভ্যন্তরে গড়ে তোলে — ''The non-economic super-structure which grows up on the basis of finance capital, its politics and its ideology, stimulates the striving for colonial conquest.'' *(Ibid)* লেনিন আরও বলেছিলেন, লগ্নিপুঁজি স্বাধীনতা চায় না, চায় অধীনতা। (২) লেনিন দেখিয়েছিলেন, বৃহৎ লগ্নিপুঁজির জোট গোটা বিশ্বকে ভাগাভাগি করে শোষণ করে, তারা তাদের নিজ নিজ ভূখণ্ডকেও একই সাম্রাজ্যবাদী কায়দায় শোষণ করে। (৩) লগ্নিপুঁজির শাসন ও শোষণ এমনই জবরদস্ত যে, একটি দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অক্ষত রেখেও তাকে আর্থিকভাবে পদানত করতে পারে। (''Finance capital is such a great, it may be said, such a decisive force in all economic and in all international relations, it is capable of subjecting, and actually does subject, to itself even the state, enjoying the fullest independence.'' — Lenin, *ibid*)

সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি বা লগ্নিপুঁজি আজ একটি সার্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করেছে। ফলে অপেক্ষাকৃত কম উন্নত বা 'উন্নয়নশীল' পুঁজিবাদী দেশগুলিরও পুঁজির মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সাম্রাজ্যবাদী হয়ে পড়েছে। এইসব দেশ নিজ নিজ অর্থনৈতিক ক্ষমতা অনুযায়ী উন্নত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সাথে যেমন দরকষাকষি করছে, সাথে সাথে নিজেরা সেই দরকষাকষির ক্ষমতাকে বাড়াবার চেষ্টা করছে। তারাও বিশ্বজোড়া লগ্নিপুঁজির সাম্রাজ্যে ছোট হিস্যাদার হয়ে উঠছে। ভারতবর্ষ তার মধ্যে অন্যতম। একথা বহু পূর্বে কমরেড শিবদাস ঘোষ তাঁর প্রজ্ঞাদীপ্ত বিশ্লেষণের সাহায্যে দেখিয়েছিলেন। অর্থাৎ এসব দেশ উন্নত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির কাছে যেমন তাদের অর্থনীতির দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়, বিনিময়ে তারাও অপর দেশের অর্থনীতিতে পুঁজি লগ্নি করার অধিকার চায়। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, আজকে মূলধনী দ্রব্যকে (capital goods) যেমন পুঁজি হিসাবেই গণ্য করা হয়, তেমনই সেই ধারাতেই প্রযুক্তি বা তার জ্ঞানও (technical knowhow) পুঁজি হিসাবে বিবেচিত হয়। আজকের প্রযুক্তির দুনিয়ায় কোন কোন বিশেষ দেশের বিশেষ পুঁজিপতি বিশেষ প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অধিকারী হচ্ছে। সেই প্রযুক্তি বা জ্ঞানকেও সে লগ্নি করছে পুঁজি হিসাবে। অর্থাৎ বিশ্বায়নে গোটা দুনিয়ায়

পাঁচের পাতায় দেখুন

পুঁজিবাদী উন্নয়নের সঙ্গে জনস্বার্থের কোন সম্পর্ক নেই

চারের পাতার পর

একটা অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রযুক্তিলব্ধ জ্ঞানের বিভাজন হচ্ছে, আর সেই জ্ঞানকে ব্যবহার করা হচ্ছে মুনাফা লোটার যন্ত্র হিসাবে।

সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি থেকে তার রাজনীতিকে আলাদা করা যায় না

এই অবস্থায় সিপিএমের মতো একটি দল, যারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কথা বলে, তাদের নেতারা 'পুঁজির কোন শ্রেণীচরিত্র নেই বলে লগ্নিপুঁজির জন্য ইউরোপ-আমেরিকা থেকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়া সর্বত্র হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এর সাথে এদেশের বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠীকে, যাদের চরিত্রও সাম্রাজ্যবাদী হয়ে পড়েছে, দিনরাত্রি ভজনা করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য থেকে শিক্ষা — সর্বক্ষেত্রে জনগণকে লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে এই দেশি-বিদেশি বৃহৎ লগ্নিপুঁজির জন্য লাল কার্পেট বিছিয়ে দেওয়ার উলঙ্গ প্রচেষ্টা চলছে। আর তাদের যেসব সৎ কর্মী এবং জনগণ ভুল বুঝে এই দলের সাথে আছেন দলের নেতারা তাঁদের বোঝাচ্ছেন যে, পুঁজির কোন রঙ নেই, অর্থাৎ কোন শ্রেণীচরিত্র নেই। বলছেন, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই সবসময়ই জারি আছে — যেন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইটা সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াই নয়। সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি যেন কল্যাণকর, কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিটাই ক্ষতিকারক। এ প্রসঙ্গে কমরেড লেনিনের একটি অমূল্য শিক্ষাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তিনি বলেছিলেন, ''Politics is the concentrated expression of economics... Politics must take precedence over economics. To argue otherwise is to forget the ABC of Marxism.'' — Once again on the Trade Unions. এর মর্মার্থ হল রাজনীতি হচ্ছে অর্থনীতির ঘনীভূত রূপের প্রকাশ। রাজনীতিকে অবশ্যই অর্থনীতির পুরোভাগে নেতৃত্বের ভূমিকায় বুঝতে হবে। এ বিষয়ে অন্যভাবে যুক্তি করার অর্থ হল মার্কসবাদের অ, আ, ক, খ-কে ভুলে যাওয়া। এখন অনিল বিশ্বাস, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বা নিরুপম সেনরা তেং শিয়াও পিংকেই নেতা মেনেছেন। এই তেং শিয়াও পিং-ই বলেছিলেন, 'বেড়াল কালো কি সাদা তা জানার দরকার নেই, সে ইঁদুর ধরতে পারলেই হল।' দীর্ঘ 'লং মার্চে'র বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের মাধ্যমে যে চীনে একদিন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তেং-এর রাস্তায় প্রতিবিপ্লবের মাধ্যমে সেখানে আজ পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই 'তেংবাদ'ই আজ সিপিএম-এর মতবাদ। এইভাবেই এই দলের নেতারা দেশি-বিদেশি পুঁজির সেবা করে জনস্বার্থ তথা শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থকে বলি দিচ্ছেন। এজন্য তাঁরা পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে উন্নয়নের ধূয়ো তুলে মানুষকে ঠকাতে চাইছেন।

উন্নয়ন কোন্ পথে

দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার সুবাদে সিপিএম নেতৃত্ব আর কিছু করতে পারুক আর না পারুক, জনগণের আর্থিক দুরবস্থা ও বামপন্থী আন্দোলনের দুর্বলতা ও তজ্জনিত বামপন্থী চেতনার নিম্নমানের জন্য ''উন্নয়ন'' শব্দটার উপর খানিকটা মোহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। সিপিএম নেতারা বলেছেন, আমরা পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় আছি, তাতে শোষণ থাকবে, ছাঁটাই থাকবে, তবুও তার মধ্যেই উন্নয়ন চাই। এই উন্নয়নের ফলে বেকারী, ছাঁটাই থাকা সত্ত্বেও জনগণের দুঃখ কিছুটা ঘুচবে, কর্মসংস্থান হবে। তাই উন্নয়নের জন্য পুঁজির বিনিয়োগ চাই। এই পুঁজি যখন সরকারের হাতে নেই, তখন দেশ-বিদেশ, টাটা-আম্বানি, ব্রিটেন-আমেরিকা যেখান থেকে পারা যায়, যেমন করে পারা যায় পুঁজি নিয়ে আসতে হবে এবং তা বিনিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলেই সব সমস্যার সমাধান! এ ব্যাপারে গণমাধ্যম ও সংবাদপত্রগুলি সিপিএম নেতৃত্ব তথা মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের একটি উন্নয়নমুখী ভাবমূর্তি গড়ে তোলার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। তারা দেখাতে চাইছে যেন সিপিএম দলের ভিতরে পুরনো বামপন্থী ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে লড়াই করে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এ রাজ্যে শিল্পায়নের বন্যা বইয়ে দিতে চান। কিন্তু কিছু জঙ্গি আন্দোলনের জন্য তাঁর সেই বাস্তববাদী শুভ প্রচেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। তাই কোনরকম আন্দোলন নয়, বিক্ষোভ নয়, ধর্মঘট নয়, বনধ নয়; চাই একেবারে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি, যেমনটা বুদ্ধদেববাবু চাইছেন। সেই শান্তির বাতাবরণে শ্রমিক ছাঁটাই হবে, অথচ লড়াই হবে না; কল-কারখানায় ক্লোজার হবে, কিন্তু লড়াই হবে না; বাসভাড়া বাড়বে, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়বে, হাসপাতালে চার্জ বাড়বে, শিক্ষা-চিকিৎসা মানুষের সাধ্যের বাইরে চলে যাবে, তবু মানুষ লড়বে না। এমন একটা শ্মশানের শান্তি তাঁরা চান। বিদ্যুতের দাম তিনগুণ-চারগুণ বাড়বে, উন্নয়নের নামে জনবসতি উচ্ছেদ, ঝুপড়ি উচ্ছেদ হবে, চাষী তার জমি হারাবে তবু মানুষ উন্নয়নের স্বপ্নে বিভোর হয়ে মুখ বুঁজে থাকবে। কারণ সিপিএম নেতাদের কথায় উন্নয়ন আসছে জুড়ি-গাড়ি চড়ে।

কিন্তু উন্নয়নের প্রবক্তা এসব দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী নেতারা একটা কথা গোপন করছেন যে, দেশের উন্নয়ন বলতে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের উন্নয়ন বোঝাতে পারে না। দেশের বা রাজ্যের জি ডি পি (মোট জাতীয় উৎপাদন) বৃদ্ধির চাতুরি দেখিয়ে বুর্জোয়া স্বার্থের প্রতিভূ গণমাধ্যম বা সংবাদপত্রগুলি যাই বোঝাক না কেন, তার দ্বারা লক্ষ লক্ষ ছাঁটাই হওয়া শ্রমিক, খোলামাঠে আশ্রয়হীন অবস্থায় পড়ে থাকা উচ্ছেদ হওয়া ঝুপড়িবাসী অথবা হাজার হাজার বেকার ছেলের বুকের যন্ত্রণা, রক্তে-অশ্রুতে মেশা অবরুদ্ধ বেদনাকে কিছুতেই বোঝানো যাবে না যে, দেশে সাধারণ মানুষের স্বার্থেই উন্নয়নের হাওয়া বইছে।

একটা সোজা হিসাব দিলেই বিষয়টা বোঝা যাবে। আজ থেকে ২৮/২৯ বছর আগে যখন 'বামফ্রন্ট' ক্ষমতায় এসেছিল, তখন রেজিস্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা ছিল ১৭ লক্ষ। বর্তমানে তা প্রায় ৭০ লক্ষ। এর মধ্যে বুদ্ধবাবুরা আই বি এম-এর মতো বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীকে সল্টলেকে শিল্প(?) গড়তে জমি দিয়েছেন। হায়াৎ রিজেন্সি, আই টি সি সোনার বাংলার মতো নামীদামী হোটেল ব্যবসা চালু হয়েছে, যেজন্য সিপিএম ফ্রন্ট সরকার অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে তাদের জমি দিয়েছেন। আর রাজ্য সরকার সৃষ্ট হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস তো গল্পগাথা হয়ে গিয়েছে, রক্ত দিয়ে বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কারখানা হয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে এর দ্বারা সামগ্রিকভাবে কর্মসংস্থানের দরজা একটুও খোলেনি। বরং বন্ধ হয়ে গিয়েছে উত্তর ২৪ পরগণা, দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল, বজবজ, তারাতলা, হাইডরোডের অসংখ্য ছোটবড় কারখানা। হাওড়ার শিল্পাঞ্চল শ্মশান হয়েছে। উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলি ধুঁকছে। চটকল বন্ধ হওয়া এখন নিত্যদিনের ঘটনা। প্রতি বছরই অভাবের তাড়নায় মারা যাচ্ছে বা আত্মহত্যা করছেন কয়েকশ শ্রমিক। আবার ইন্দোনেশিয়ার সালিম গোষ্ঠীর সাথে চুক্তি করে কয়েক হাজার একর চাষযোগ্য জমি সিপিএম ফ্রন্ট সরকার তাদের হাতে তুলে দেবে। তাদের ঘোষিত উদ্দেশ্য — শিল্পায়ন এবং সেই পথে উন্নয়ন। এর ফলে উচ্ছেদ হবে হাজার হাজার কৃষক। তাহলে এই উন্নয়ন কার স্বার্থে? (ক্রমশ)

ইরাকে প্রতিরোধ সংগ্রাম অব্যাহত

পেন্টাগণ ও মার্কিন মিডিয়া ইরাকের আসল ঘটনাবলীকে চেপে রেখে গল্পের গরুকে প্রায়শই গাছে তুলে দিচ্ছে। স্বভাবতই ইরাকে দখলদার বাহিনী সম্পর্কে আজ বহির্বিশ্বে নানারকম মিথ্ তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি সেই ফোলানো ফোঁপানো ফানুসটা পুরোপুরি না হলেও বেশ ভালোরকমভাবে ফেটে গেছে। মার্কিন প্রশাসনের জাতীয় নিরাপত্তা কমিটি বর্তমান ইরাক পরিস্থিতি সম্পর্কে 'ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি ফর ভিকট্রি ইন ইরাক' রিপোর্টের একটা সারাংশ ৩০ নভেম্বর 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' এবং ৩ ডিসেম্বর '০৫ 'দি হিন্দু' প্রকাশ করেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, মিত্র বাহিনীর শত চেষ্টা সত্ত্বেও ইরাকের একটা বিরাট অংশ এখন 'শত্রুদের' (এখানে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের কথা বলা হয়েছে) নিয়ন্ত্রণে। ফালুজা শহরে মার্কিন বাহিনীর যথেষ্ট দাপট থাকলেও গ্রামীণ ফালুজায় বিদ্রোহীরা খুবই শক্তিশালী। দিনের বেলাতেও মার্কিন বাহিনীর কনভয় এখানে প্রবেশ করতে ভয় পায়। মোকতাদা আল-সদর-এর মাহদি বাহিনী আত্মসমর্পণ করার পর মার্কিন বাহিনী নয়, এখন নাজাফ শহরে টহল দিচ্ছে অন্য শিয়া গোষ্ঠীদের বদর ব্রিগেড। তবে পুরনো শহর এখনও মাহদি বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। সামারা শহরেও বিদ্রোহীরা প্রভাবশালী। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে, প্রতিরোধ যোদ্ধাদের প্রতি ইরাক জনগণের সমর্থন এখন আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। প্রতিরোধ যোদ্ধাদের শক্তি সম্পর্কে উক্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, পেন্টাগণের প্রবীণ অফিসারদের মতে বিদ্রোহীদের সংখ্যা ৮৭,০০০ থেকে ২,১২,০০০। প্রতিরক্ষা দপ্তরের মতে, ''এরা ভালোভাবে ট্রেনিং প্রাপ্ত ও খুবই দক্ষ, দীর্ঘদিন লড়াই চালিয়ে যাবার ব্যাপারে এরা খুবই পারদর্শী।'' (সংবাদসূত্র ঃ দ্য হিন্দু, ৩-১২-০৫)

দক্ষিণ ইরাকের রামাদি শহর থেকে সাপ্তাহিক 'টাইম'-এর সংবাদদাতা মাইকেল ওয়ের জানাচ্ছেন, গত ১৭ নভেম্বর ৫০ জন সশস্ত্র প্রতিরোধ যোদ্ধা মর্টার ও রকেট চালিত গ্রেনেড নিয়ে রামাদি শহরে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটি আক্রমণ করে। প্রথমে গেরিলারা শহরের সরকারি ভবনগুলি লক্ষ্য করে মর্টার থেকে গোলা ছুঁড়তে শুরু করে, পরে যে হোটেলে মার্কিন ঘাঁটি গড়া হয়েছে সে হোটেল লক্ষ্য করে রকেটচালিত গ্রেনেড ছোঁড়া শুরু হয়। হোটেলটিতে আগুন ধরে যায়, বহু দূর দূর অঞ্চল থেকে আগুনের লেলিহান শিখা দেখা গেছে। হোটেলের ভেতর বহু মার্কিন সেনা আটকে পড়েছিল, আগুনে তাদের সারা শরীর ঝলসে গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের হিসাবে ৩০০ থেকে ৪০০ জন মার্কিন সেনা আগুনে পুড়ে মারা গেছে। বহু সেনা আহত হয়েছে। অ্যাম্বুলেন্সের অভাবে ট্রাকে চাপিয়ে বহু আহত সেনাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে দেখেছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। ৪ লক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত রামাদি শহর দখল নেওয়ার জন্য মার্কিন সশস্ত্র রেজিমেন্ট শহরে ঢোকার চেষ্টা করলে বিদ্রোহীদের সাথে জোর সংঘর্ষ শুরু হয়। পেন্টাগনের দেওয়া হিসাবে এই সংঘর্ষে ৩৩ জন বিদ্রোহী ও ১ জন মাত্র মার্কিন মেরিন সেনা মারা গেছে। স্থানীয় মানুষদের হিসাবে, সংঘর্ষ থামার পর বিদ্রোহীদের ৫টি মৃতদেহ মিলেছে এবং প্রায় ১৫ জন মার্কিন সেনার দেহ ট্রাকে চাপিয়ে সরিয়ে ফেলতে দেখা গেছে। বিদ্রোহীদের খোঁজে মার্কিন সেনারা রামাদি শহরে চিরুনি তল্লাসি চালায়, কিন্তু একজন বিদ্রোহীকেও তারা ধরতে পারেনি। এ সম্পর্কে জনৈক মার্কিন সেনা অফিসার তার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলে যে, ''বিদ্রোহীরা সাধারণ মানুষের মধ্যে এমনভাবে মিশে থাকে যে তাদের ধরা খুবই কঠিন। যখন দিনের বেলায় আমরা টহল দিই তখন ঐ লোকগুলোই আমাদের দিকে রুটির টুকরো ছুঁড়ে দেয়, আর রাতে এরাই আবার আমাদের বিরুদ্ধে হাতে অস্ত্র তুলে নেয়।'' (সাপ্তাহিক টাইম, ৫ -১২-০৫)

এ আই ডি ওয়াই ও'র উদ্যোগে ফুটবল টুর্নামেন্ট

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদের জন্মশতবর্ষ এবং ক্ষুদিরাম বসুর জন্মদিবস উপলক্ষে গত ৩-৪ ডিসেম্বর এ আই ডি ওয়াই ও-র কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয় সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে। ৩ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিক ভাবে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড স্বপন দেবনাথ। টুর্নামেন্ট সফল করতে এলাকার বহু প্রতিষ্ঠান, যুবক ও সাধারণ মানুষ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। ৪ ডিসেম্বর প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলাগুলি এবং পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়ী দল বিনয় বসু ব্রিগেড (সোনারপুর) এবং বিজিত দল রাজগুরু ব্রিগেড (মধ্য কলকাতা)-এর খেলোয়াড়দের হাতে যথাক্রমে কমরেড সৌরভ বসু মেমোরিয়াল কাপ ও কমরেড লীনা মুখার্জী মেমোরিয়াল কাপ তুলে দেন প্রখ্যাত ভারতীয় অলিম্পিক ফুটবলার সাহু মেওয়ালাল।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এ আই ডি ওয়াই ও রাজ্য সভাপতি কমরেড সুরথ সরকার, রাজ্য সহ-সভানেত্রী কমরেড প্রতিভা নায়ক এবং কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড নিরঞ্জন নস্কর।

মেদিনীপুরে ফুটবল টুর্নামেন্ট

এ আই ডি ওয়াই ও-র নারায়ণগড় শাখা সম্মেলন উপলক্ষে ৩১ অক্টোবর - ১ নভেম্বর ১৬টি টিম নিয়ে দু'দিনের ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। টুর্নামেন্ট উদ্বোধন করেন জেলা কমিটির সভাপতি কমরেড চিত্ত পড়্যা। বিজয়ী দল বাসন্তী অ্যাথলেটিকস টিম ও বিজিত দল বালিচাতুরি মিলন সংঘের হাতে ট্রফি তুলে দেন কমরেড চিত্ত পড়্যা এবং কমরেড সূর্য পড়্যা। ধারাবাহিকভাবে ডি ওয়াই ও পরিচালিত এই টুর্নামেন্ট এলাকার যুবকদের উৎসাহিত করে।

প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড তমাল সামন্ত। সম্মেলনে কমরেড অশোক করকে সভাপতি এবং কমরেড মদন ভুঞ্যাকে সম্পাদক করে ১৮ জনের কমিটি গঠিত হয়।

পরিচারিকা আন্দোলনের জয়

ট্রেনের চেকারদের অমানুষিক নির্যাতনের হাত থেকে অবশেষে রেহাই পেলেন হতদরিদ্র পরিচারিকারা। অথচ তাঁদের কোন অপরাধ ছিল না। প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট থাকা সত্ত্বেও মথুরাপুর স্টেশন কর্তৃপক্ষ তাঁদের স্বল্পমূল্যের মাসিক টিকিট দিচ্ছিলেন না। ওদিকে জয়নগর মিউনিসিপ্যালিটি এবং বিডিও অফিসের প্রশাসনিক জটিলতায় দীর্ঘদিন ধরে চরম হয়রানির শিকার হচ্ছিলেন জয়নগর স্টেশনকেন্দ্রিক পরিচারিকা মা-বোনেরা। সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির নেতৃত্বে তাঁরা বিভিন্ন স্তরে মিটিং, মিছিল, স্বাক্ষর সংগ্রহ, ডেপুটেশন প্রভৃতি আন্দোলনের মাধ্যমে অবশেষে জয়লাভ করেছেন। উভয় স্টেশন থেকেই ঐ টিকিট দেওয়া শুরু হয়েছে।

ডব্লুটিও'র শর্ত মেনে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের বিরুদ্ধে এ আই ডি এস ও'র আন্দোলন

১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারি গ্যাট-এর নাম পাল্টে 'বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা' করার পর সদস্য দেশগুলি ১৯৯৬ সালে পরিষেবা ক্ষেত্রকেও পুরোপুরি ব্যবসার আওতায় আনার জন্য চুক্তি করতে সম্মত হয়। এই চুক্তির নাম দেওয়া হয় General Agreement on Trade in Services (GATS)। এ পর্যন্ত স্বাস্থ্য, শিক্ষা, টেলিকমিউনিকেশন, পানীয় জল সহ যে ১৯টি পরিষেবা ক্ষেত্রকে তারা ব্যবসার জন্য চিহ্নিত করেছে, তার মধ্যে শিক্ষা হল অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র। গ্যাটস্-এ বলা হয়েছে, ব্যবসার এক বিরাট ক্ষেত্র হল পরিষেবা যেটা এতদিন উন্মুক্ত ছিল না।

ডব্লু টি ও'র বক্তব্য, সরকারগুলি যদি পরিষেবা ক্ষেত্রে অনুদান বা ভর্তুকি দেয়, তাহলে বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই WTO থেকে নির্দেশ আসছে — পরিষেবা ক্ষেত্রে ভর্তুকি বন্ধ কর। GATS-এ স্বাক্ষরকারী সদস্য দেশগুলিকে একে অপরকে 'Most Favoured Nation' (সবচেয়ে সুবিধাপ্রাপ্ত দেশ) হিসাবে ঘোষণা করতে হবে এবং দেশীয় বিনিয়োগকারী ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মধ্যে কোন রকম বৈষম্য না করে সকলকেই সমান সুযোগ দিতে হবে। ভারতবর্ষ ডব্লিউ টি ও-র সদস্য হিসাবে উদারীকরণের নীতি পুরোপুরি গ্রহণ করলেও এবং এদেশে পরিষেবাকে ব্যবসায়ীদের মুনাফা লুঠবার ক্ষেত্রে পরিণত করলেও তাদের কিছুটা আশঙ্কা ছিল পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির বিনিয়োগকারীরা এদেশে এলে প্রতিযোগিতায় এদেশের বিনিয়োগকারীরা এঁটে উঠতে পারবে কি না। শিক্ষাক্ষেত্রেও তাদের এই আশঙ্কা ছিল। তাই দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রস্তাবে তারা বলেছে — ''Although India has approved complete liberalization on Trade in Educational Services, it may not be able to withstand the international pressure unless she prepares well for the second round of WTO negotiations. The matter is urgent and the Government should therefore appoint committee / Task Force to advise on (a) negotiation on higher education issues in WTO and (b) issues relating to erecting the safeguards for the post-negotiations market access regime''. সেইসঙ্গে শিক্ষায় বিনিয়োগে পুঁজিপতিদের আকাঙ্ক্ষা জানার উদ্দেশ্যে দুই পুঁজিপতি কুমারমঙ্গলম বিড়লা ও মুকেশ আম্বানিকে সদস্য করে এক শিক্ষা কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এই আম্বানি-বিড়লা কমিটিও সরকারকে শিক্ষায় ভর্তুকি বন্ধ করার সুপারিশ করেছে এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফি বাড়িয়ে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমান করতে বলেছে। শিক্ষা যে মুনাফা করার একটি লোভনীয় ক্ষেত্র তা জানাতে গিয়ে এই কমিটি বলেছে — ''কৃষি, শিল্প বা পরিকাঠামো ক্ষেত্রের থেকেও শিক্ষাক্ষেত্রে মুনাফার হার অনেক বেশি।'' ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবসায়ীরাও যে বিদেশে শিক্ষার বাজার দখল করতে পারবে তার উল্লেখ করে আম্বানি-বিড়লা কমিটি বলেছে — 'এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও পূর্ব ইউরোপে ভারতীয় শিক্ষাব্যবসার ভাল বাজার আছে।' ডব্লুটিও'র শর্ত অনুযায়ী এবং এদেশের পুঁজির স্বার্থ রক্ষা করে শিক্ষাকে গ্যাটস-এর আওতায় আনার ক্ষেত্রে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক বাধাগুলি দূর করতে ভারত সরকার এক বছর আগে দু'টি কমিটিও গঠন করে। এই কমিটি দু'টির একটি হ'ল সংসদ সদস্য ভায়লার রবির নেতৃত্বে পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি, অন্যটি হ'ল প্রফেসর সি এন আর রাও-এর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে আজ ভারত সরকার গ্যাটস্-এর আওতায় শিক্ষাকে আনার সব ব্যবস্থা পাকা করে হংকং-এ ডব্লু টি ও'র সম্মেলনে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী কমল নাথকে পাঠিয়েছে চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে শিক্ষার উপর যে আক্রমণ আসবে তা হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।

শিক্ষাকে ব্যবসার ক্ষেত্র হিসাবে খুলে দিলেও এখনও পাশাপাশি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। প্রচুর পরিমাণে ফি বাড়ালেও এখনও আই আই টি, সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল ও ম্যানেজমেন্ট কলেজ বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ফি বেসরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের তুলনায় কম। গ্যাটস্-এর আওতায় শিক্ষাকে আনার পর বেসরকারি মালিকানাধীন এই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি দাবি করে যে, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্র বেতন কম হওয়ায় সেখানে বেশি ছাত্র ভর্তি হচ্ছে এবং তাদের ব্যবসায় ক্ষতি হচ্ছে, তবে সরকার সাহায্য বন্ধ করতে বাধ্য। অর্থাৎ ফি বেড়ে যাবে বহুগুণ। গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার আর কোনরকম সুযোগই থাকবে না। এদেশের পুঁজিপতিরাও একইভাবে অন্য দেশে শিক্ষায় বিনিয়োগ করতে পারবে অবাধে এবং সেইসব দেশের সরকারকে শিক্ষায় বরাদ্দ বন্ধ করতে বাধ্য করবে।

দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের শিক্ষায় বিনিয়োগ করা ও মুনাফা করার দৃঢ় ও প্রকাশ্য সমর্থক এদেশের কংগ্রেস, বিজেপি প্রভৃতি দক্ষিণপন্থী দল। কিন্তু সিপিএম-সিপিআই'ও তার বিরোধী নয়। পশ্চিমবাংলায় তাদের পরিচালিত ফ্রন্ট সরকারের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন — ''আমরা বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়কে সেইসব বিষয় পড়াতে স্বাগত জানাব, যেগুলি অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ।'' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫-৩-০৫) কিন্তু সকলেই জানেন, ব্যয়সাপেক্ষ বিষয় পড়াতেই শিক্ষা ব্যবসায়ীরা বেশি আগ্রহী, কারণ সেক্ষেত্রে তাদের মুনাফা বেশি। কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সুর মিলিয়ে গত ১২ ডিসেম্বর, সি আই আই এবং এ আই সি টি ই আয়োজিত আলোচনাচক্রে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী পুনরায় বলেছেন — ''এখানকার ছাত্ররা যাতে টেকনিক্যাল ও বৃত্তিমূলক জ্ঞান বাড়াতে পারে তার জন্য আমরা বেশ কয়েকটি বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে 'মউ' স্বাক্ষর করেছি।''

শিক্ষার অধিকারের উপর এই পুঁজিবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশজোড়া আন্দোলনের ডাক দিয়েছে এ আই ডি এস ও।

শিক্ষাকে গ্যাটসের আওতায় আনার প্রতিবাদে ছাত্র বিক্ষোভ

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার হংকং সম্মেলনের বিরুদ্ধে, শিক্ষাকে গ্যাটস্ এর আওতায় আনার প্রতিবাদে এবং কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা মেডিকেল-ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ম্যানেজমেন্ট কোটা এবং এন আর আই-কোটাকে আইনি বৈধতা দেওয়ার জন্য পার্লামেন্টে বিল পেশ করার প্রতিবাদে এ আই ডি এস ও'র সর্বভারতীয় কমিটির আহ্বানে সারা দেশের সাথে পশ্চিমবঙ্গেও ১৩ ডিসেম্বর প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। কোচবিহার থেকে মেদিনীপুর — প্রতিটি জেলায় এদিন বিক্ষোভ সভা, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে মিছিল, গেট মিটিং ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত বিল ও গ্যাটস-এর প্রস্তাবের প্রতিলিপি পোড়ানো হয়। শিলিগুড়ি শহরের কোর্ট মোড়ে, বাঁকুড়ার মাচানতলায়, বীরভূমের রামপুরহাট কলেজ গেটে, কোচবিহারের মাথাভাঙা, দিনহাটা ও মেখলিগঞ্জে, উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে ও ইসলামপুরে, নদিয়ার রানাঘাট সহ বিভিন্ন জায়গায় এই কর্মসূচি পালিত হয়।

কলকাতায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রীট ক্যাম্পাসের বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন এ আই ডি এস ও'র সর্বভারতীয় অফিস সম্পাদক কমরেড মৃদুল দাস, কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড আয়সানুল হক এবং সুজিত পাত্র ও বনমালী পণ্ডা।

১৩ ডিসেম্বর প্রতিবাদ দিবসে বিভিন্ন রাজ্যে বিক্ষোভ।
(উপরে) বাঙ্গালোর (মাঝে) ভুবনেশ্বর এবং নিচে কলকাতা

শিক্ষামন্ত্রীর কাছে প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের ডেপুটেশন

লটারির মাধ্যমে ভর্তির সিদ্ধান্ত বাতিল, হাজার হাজার শূন্যপদে অবিলম্বে শিক্ষক নিয়োগ, কলকাতায় অবিলম্বে মিড ডে মিল দেওয়ার ব্যবস্থা, শিক্ষাদান ব্যতিরেকে অন্য কোন কাজে শিক্ষকদের নিয়োজিত না করা, কর্মরত অবস্থায় মৃত শিক্ষকের পোষ্যকে অবিলম্বে নিঃশর্তে নিয়োগ, শিক্ষকদের মাস পয়লা বেতন ও অবসরের সঙ্গে সঙ্গে পেনশন প্রদান, শিক্ষাবর্ষের শুরুতে সব ছাত্রছাত্রীকে সমস্ত পাঠ্যপুস্তক প্রদান, প্রাথমিক স্তরে পাশ-ফেল প্রথা ও চতুর্থ শ্রেণীতে বৃত্তিপরীক্ষা চালু করা ইত্যাদি ১৪ দফা দাবিতে ২৮ নভেম্বর বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির (বিপিটিএ) পক্ষ থেকে শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাসের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

দীর্ঘ এক ঘণ্টাব্যাপী আলোচনায় শিক্ষামন্ত্রী কিছু কিছু সমস্যা পূরণের আশ্বাস দেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, বিভিন্ন জেলায় কিছু শিক্ষক নিয়োগ করা হবে, শিক্ষকদের বেতনের দিন এগিয়ে আনার চেষ্টা হচ্ছে, মৃত শিক্ষকের পোষ্যকে চাকরি দেওয়া হবে ইত্যাদি।

কিন্তু মূল সমস্যাটি সম্পর্কে কোন সুষ্ঠু সমাধানের আশ্বাস না পাওয়ায় প্রতিনিধি দল ক্ষুব্ধ হন। অদূর ভবিষ্যতে সার্কেল, জেলা ও রাজ্য পর্যায়ে আরও তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করা হয়।

প্রতিনিধি দলে ছিলেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক কার্তিক সাহা, অজিত হোড়, তপতী মিত্র, বীরেন দেব প্রমুখ।

প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী ও ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র সর্বভারতীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য

কমরেড গণেশ দাশগুপ্ত'র জীবনাবসান

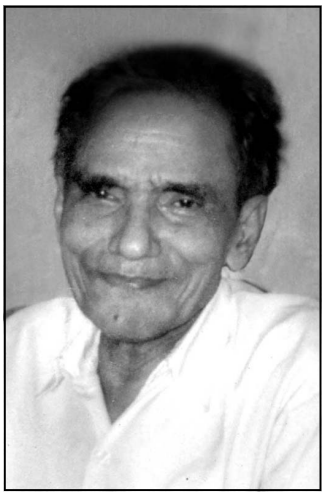

প্রবীণ স্বাধীনতী সংগ্রামী ও ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র সারা ভারত ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য, রাজ্যের বহু গণআন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা ও সংগঠক কমরেড গণেশ দাশগুপ্ত ৭৭ বছর বয়সে ১৬ ডিসেম্বর রাতে কলকাতা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

১৭ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় তাঁর মরদেহ হাসপাতাল থেকে সংগঠনের কেন্দ্রীয় দপ্তরে আনার পর অসংখ্য অনুরাগী, বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন ও গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন। সংগঠনের উপদেষ্টা, এস ইউ সি আই দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর পক্ষে মাল্যদান করেন এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য। এছাড়াও মাল্যদান করেন সংগঠনের প্রাক্তন সভাপতি কমরেড অনিল সেন, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক কমরেড তাপস দত্তের পক্ষে কমরেড সনৎ দত্ত, সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তীর পক্ষে কমরেড সুনীল মুখার্জী, প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ কমরেড সীতেশ দাশগুপ্তের পক্ষে কমরেড অচিন্ত্য সিনহা, সাধারণ সম্পাদক কমরেড শংকর সাহা ও অন্যান্য রাজ্য ও জেলা নেতৃবৃন্দ। মাল্যদান করেন কৃষক ও ক্ষেতমজুর ফেডারেশনের সভানেত্রী কমরেড প্রতিভা মুখার্জী, সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সর্বভারতীয় সভানেত্রী কমরেড ছায়া মুখার্জী। গণদাবী'র প্রধান সম্পাদক কমরেড রণজিৎ ধরের পক্ষে মাল্যদান করেন কমরেড সলিল চক্রবর্তী। শবদেহবাহী গাড়ি এস ইউ সি আই অফিসের সামনে থামে। মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ, কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড মানিক মুখার্জী, রাজ্য অফিস সম্পাদক কমরেড স্বপন বোস। এছাড়াও সিটু নেতা কমরেড কালি ঘোষ, ইউ টি ইউ সি নেতা কমরেড অশোক ঘোষ, এ আই টি ইউ সি নেতা কমরেড জ্যোতি লাহিড়ী, এ আই সি সি টি ইউ নেতা কমরেড বাসুদেব বোস, কমরেড অতনু চক্রবর্তী, বিএমএস নেতা গৌরগোপাল ঘোষ শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন। কমরেড গণেশ দাশগুপ্তের সংগ্রামী জীবনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য সারা দেশের সমস্ত রাজ্য ও আঞ্চলিক কার্যালয়ে তিন দিনের জন্য রক্তপতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়।

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র সর্বভারতীয় কমিটির শ্রদ্ধার্ঘ

শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থে বিপ্লবী শ্রমিক সংগঠন এবং আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে নিবেদিত প্রাণ ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র সারা ভারত ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য কমরেড গণেশ দাশগুপ্ত দীর্ঘ রোগভোগের পর ১৬ ডিসেম্বর, ২০০৫ মধ্যরাত্রে ১২-৪৫ মিনিটে কলকাতা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বিগত কয়েক বছর যাবত শ্বাসকষ্টজনিত ব্যাধিতে আক্রান্ত শয্যাশায়ী কমরেড দাশগুপ্ত জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত মৃত্যুর সঙ্গে সচেতনভাবে দৃষ্টান্তমূলক লড়াই চালিয়ে গেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নেতা ও একনিষ্ঠ সংগঠকের মৃত্যুতে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র সারা ভারত কমিটি গভীর শোক প্রকাশ করছে, তাঁর সংগ্রামী জীবনের প্রতি নিবেদন করছে গভীর শ্রদ্ধা ও তাঁর বিপ্লবী স্মৃতির প্রতি সম্মানের জন্য সারা দেশের সমস্ত রাজ্য ও আঞ্চলিক কার্যালয়ে তিন দিনের জন্য রক্তপতাকা অর্ধনমিত রাখছে। কমরেড গণেশ দাশগুপ্ত অবিভক্ত বাংলার ঢাকা জেলায় ১৯২৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনে স্বাধীনতা আন্দোলনে আপসহীন ধারার সাথে যুক্ত হন এবং কারাবরণ করেন।

১৯৬৬-৬৭ সালে কমরেড গণেশ দাশগুপ্ত ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র নেতৃত্বে শ্রমিক ইউনিয়ন ও আন্দোলন করতে গিয়ে চাকরি থেকে বরখাস্ত হন। এই সময়েই তিনি ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর চিন্তাধারার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। শুরু হয় তাঁর নতুন জীবন, নতুন পথ চলা। ভারতবর্ষের একমাত্র বিপ্লবী দল এস ইউ সি আইয়ে যোগ দিয়ে দলই জীবন, বিপ্লবই জীবন — এই আদর্শের ভিত্তিতে দলের সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে গড়ে তোলার সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত করেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের বিপ্লবী চিন্তায় প্রভাবিত হয়ে কমরেড দাশগুপ্ত তাঁর নতুন জীবনের সূচনা পর্বেই ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অফিস সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকদের সংগঠন গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ওয়েস্টবেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন গড়ে তোলা ও পরিচালনার কাজে তিনি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রের শ্রমিক কর্মচারীদের সংগঠন ও আন্দোলনের একজন বিশ্বস্ত সৈনিক হয়ে ওঠেন। তিনি ছিলেন এরাজ্যের বহু শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ও সম্পাদক।

একদিকে অফিস পরিচালনা অন্যদিকে মাঠে-ময়দানে শ্রমিকদের সংগ্রামে সামিল থাকা এই উভয় কাজেই তিনি অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। হওয়ার পর থেকে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র সেন্টারে স্থানান্তরিত হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি গভীর নিষ্ঠার সাথে ৭৭/২/১ লেনিন সরণীতে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির অফিস সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় শিক্ষিত সহজ সরল ও অনাড়ম্বর এই মানুষটি ছিলেন বহু দুর্লভ গুণের অধিকারী। যাদের সাথে তিনি পরিচিত হতেন এবং যারা তাঁর সংস্পর্শে আসতেন অল্পসময়ের মধ্যেই তিনি হয়ে উঠতেন তাদের আত্মীয় এবং আপনজন। ছোটবড় সকলেরই তিনি ছিলেন 'গণেশদা'। কমরেড শিবদাস ঘোষের যে শিক্ষাটি তিনি সুন্দরভাবে আয়ত্ত করেছিলেন এবং জীবনে প্রয়োগ করেছিলেন সেটি হল — বিপ্লবের প্রয়োজনে, সংগঠনের প্রয়োজনে কোনও কাজই ছোট নয়। অনেক বেশি বয়সেও যখন তিনি অনেক বড় পদে আসীন তখনও দেখা গিয়েছে তিনি নিঃসংশয়ে নির্দ্বিধায় সমস্তরকম কাজ হাসিমুখে করে চলেছেন। তাঁর চরিত্রের এই বিশেষ দিকটির জন্য তিনি হয়ে উঠেছিলেন সবারই অশেষ শ্রদ্ধা, আদর ও ভালবাসার পাত্র। তিনি ছিলেন আত্মপ্রচার বিমুখ, একনিষ্ঠ নীরব এক কর্মী। দীর্ঘদিন তিনি অফিসে কাটিয়েছেন এবং নিজ হাতে রান্না করেই খেতেন। বহু দুঃখে কষ্টে এমনকী অনাহারেও তিনি দিন কাটিয়েছেন যা অনেকেই জানতে পারতেন না। শ্রমিকশ্রেণী, বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলন এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী দলের সঙ্গে একাত্মতার সংগ্রামে তিনি অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিলেন। এই বিপ্লবী চরিত্র অর্জনের জন্য কমরেড গণেশ দাশগুপ্ত যে সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র সারা ভারত কমিটি তা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছে এবং এই প্রয়াত নেতাকে লাল সেলাম জানাচ্ছে।

কমরেড গণেশ দাশগুপ্ত লাল সেলাম।

১৯৬৯ সালে ঝরিয়ায় অনুষ্ঠিত সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্মেলনে কমরেড দাশগুপ্ত সারা ভারত জেনারেল কউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন ; ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন ১৯৭৯ সালে পাটনায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় সম্মেলনে। অসুস্থ

কমরেড গণেশ দাশগুপ্তর মরদেহে মাল্যার্পণ করে লাল সেলাম জানাচ্ছেন (ডান দিক থেকে) কমরেডস্ অসিত ভট্টাচার্য, অনিল সেন, সনৎ দত্ত, অচিন্ত্য সিনহা ও সুনীল মুখার্জী

কমরেড নীহার মুখার্জীর শোক

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর সর্বভারতীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য প্রবীণ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা কমরেড গণেশ দাশগুপ্তর মৃত্যুতে গভীর শোক ও বেদনা প্রকাশ করে, এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক ও ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর উপদেষ্টা কমরেড নীহার মুখার্জী ১৭ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে কমরেড গণেশ দাশগুপ্ত'র নিবেদিতপ্রাণ চরিত্রকে স্মরণ করে বলেন, ভারতের বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি দায়বোধের যে দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গিয়েছেন, তা ভবিষ্যতের ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও কর্মীদের জীবনে গভীর প্রেরণার উৎস রূপে বরাবর বিরাজ করবে।

মেদিনীপুর

বাস চলাচলে অব্যবস্থার প্রতিবাদে গণঅবস্থান ও ডেপুটেশন

এস ইউ সি আই-এর উদ্যোগে ১২ ডিসেম্বর পূর্বমেদিনীপুর জেলা শাসক অফিসের গেটে বাসভাড়াবৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং রাত ১১টা পর্যন্ত বাস চলাচলের দাবিতে দুই শতাধিক মানুষ গণঅবস্থান ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। অবস্থানে বক্তব্য রাখেন দলের জেলা সম্পাদক কমরেড মানব বেরা, জেলাকমিটির সদস্য কমরেডস্ তপন ভৌমিক এবং হীরেন্দ্রনাথ জানা, সন্তোষ শী, গোষ্ঠ কুইল্যা, অশোকতরু প্রধান এবং জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড আশুতোষ সামন্ত। বক্তারা বলেন — আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম ৬৯ ডলার থেকে কমে ৫৩ ডলার হওয়া সত্ত্বেও তেল ব্যবসায়ীদের মুনাফা লোটার স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকার তেলের দাম কমাচ্ছে না। তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, দিল্লিতে প্রথম স্টেজে ভাড়া যেখানে ২·০০ টাকা, আমেদাবাদে ১·০০ টাকা, ত্রিবান্দ্রমে ২·৫০ টাকা — সেখানে পশ্চিমবাংলায় ৪·০০ টাকা। মেদিনীপুর জেলায় স্টেজভিত্তিক বাসভাড়া চালুর দাবি করেন বক্তারা।

অবস্থান মঞ্চ থেকে কমরেডস্ মানিক মাইতি, তপন ভৌমিক, মন্মথ দাস, অশোকতরু প্রধান জেলা-শাসকের হাতে রাজ্য পরিবহন মন্ত্রীর উদ্দেশে পাঠানো ৩৫২৫ জন বাসযাত্রীর স্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি জমা দেন। তিনি বেশি রাত পর্যন্ত বাস চলাচল ও স্টেজের দৈর্ঘ্য যাচাই করার আশ্বাস দেন। গণঅবস্থানের পরে একটি মিছিল তমলুক শহর পরিক্রমা করে।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শাসক অফিসে অবস্থান ও এডিএম-এর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে প্রতিনিধিত্ব করেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড পঞ্চানন মান্না, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড অমল মাইতি, প্রাণতোষ মাইতি প্রমুখ।

কাঁথি এস ডি ও অফিসে দলের উদ্যোগে একই দাবিতে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস্ জীবন দাস, জগন্নাথ দাস ও কল্পনা দাস।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

ভোটে জেতার জন্য সি পি এম'কে আজ পুলিশের উপরই নির্ভর করতে হচ্ছে

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সম্প্রতি রাজ্য পুলিশের নন গেজেটেড পুলিশ কর্মচারী সমিতির এক সভায় তাঁর শেষ ইচ্ছা ব্যক্ত করে বলেছেন, আগামী নির্বাচনে জিতে বামফ্রন্টের সপ্তমবারের জন্য ক্ষমতায় আসাটা যেন তিনি দেখে যেতে পারেন। জ্যোতি বসুর এই আবেদনের মধ্য দিয়ে পুলিশকে ক্ষমতাদখলের কাজে ব্যবহার করার যে চিত্রটি নগ্ন হয়ে পড়ল কয়েক মাস আগে তারই বিবরণ দিয়েছিলেন রাজ্য পুলিশের আই জি নজরুল ইসলাম উক্ত পুলিশ কর্মী সমিতিরই মুখপত্রে। রাজ্য পুলিশেরই একজন গুরুত্বপূর্ণ অফিসারের তোলা অভিযোগের যেখানে গুরুত্ব সহকারে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন ছিল, প্রয়োজনে বিধানসভা ডেকে আলোচনা করা দরকার ছিল, সেখানে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তাকে 'বোগাস' বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, কোন তদন্ত হয় নি, বিধানসভা তো ডাকাই হয় নি। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক, প্রশাসনের কেউ না হয়েও কয়েক ধাপ এগিয়ে উক্ত আই জি-কে হুমকি দিয়ে বলেন, 'সরকারি পদে বসে কোন্ অধিকারে তিনি এসব অভিযোগ তোলেন!'

প্রশাসনের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলির মতো পুলিশও দলমত নির্বিশেষে নিরপেক্ষ আচরণ করবে — এটাই গণতান্ত্রিক রীতি। অথচ, রাজ্যের মানুষ অভিজ্ঞতায় দেখেছেন, অতীতের কংগ্রেস শাসনের মতোই সিপিএম শাসনেও পুলিশকে নগ্নভাবে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। ভিন্ন রাজনীতিতে বিশ্বাসী মানুষদের নিজেদের বশে আনা, বিরোধীদের সংগঠন ভাঙা, বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া, শারীরিক নিপীড়ন চালানো, জেলবন্দী করা প্রভৃতি কাজে সিপিএম আকছার পুলিশকে ব্যবহার করে আসছে। পাশাপাশি সরকারি দলের নেতা-কর্মী-সমাজবিরোধীদের অবাধ লুঠতরাজ, খুন, হামলার সময়ে পুলিশকে বিপরীত ভূমিকায় দেখা যায়। নির্বাচনে 'বিপুল জয়' নিশ্চিত করতে রিগিং, ছাপ্পা, বুথ দখলের সময়ে পুলিশকে কীভাবে ঠুঁটো জগন্নাথ করে রাখা হয় তাও এ রাজ্যের মানুষের অজানা নয়। এ প্রসঙ্গে উক্ত আই জি লিখেছেন, ''যেখানে নিজের দলের জোর বেশি সেখানে অস্ত্রহীন দুটো হোমগার্ড বা এন ভি এফ দেওয়া হয়, যেখানে বিরোধী পার্টির জোর বেশি সেখানে প্রচুর পরিমাণে সশস্ত্র পুলিশ দেওয়া হয়। বাইরে থেকে যেসব সি আর পি এফ, বি এস এফ, সি আই এস এফ প্রভৃতি বাহিনীর লোক আসে তাদের ঠিকমত ব্যবহার না করে কোথাও নিরাপদ দূরত্বে বসিয়ে রাখা হয়। শাসক দলের লোকেরা অসৎ উপায় অবলম্বন করলেও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না।'' তাঁদের এই আচরণ তিন দশকের চর্চায় এতটাই স্বাভাবিক হয়ে গেছে যে, পরবর্তী নির্বাচনে জেতার জন্য পুলিশের সাহায্য চাইতে জ্যোতি বসু এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করেন না। তিনি বলেছেন, 'পুলিশের সভায় এইভাবে রাজনীতির কথা বলা উচিত কিনা জানি না।' একথার দ্বারাই জ্যোতিবাবু বলে দিলেন, অধিকার যে তাঁর নেই সেকথা তিনি খুব ভালই জানেন। তবুও তিনি একথা বলতে পারছেন, কারণ সিপিএম দলের নেতা হওয়ার সুবাদে আইন তাকে ছোঁবে না। এতটাই আইনের ঊর্ধ্বে তিনি। জ্যোতিবাবু পুলিশ কর্মচারীদের স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলেননি যে, পুলিশের ইউনিয়ন করার অধিকার তাঁরাই দিয়েছেন। অতএব সিপিএমের হয়ে কাজ করাটা পুলিশের বাধ্যতার মধ্যেই পড়ে।

জ্যোতিবাবু-অনিলবাবুদের এই আচরণ শুধু পুলিশের ক্ষেত্রেই নয়, সরকার পরিচালনার প্রতিটি ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষকদের সভায় গিয়েও মুখ্যমন্ত্রী থেকে শিক্ষামন্ত্রী বলে আসছেন, তাদের আমলেই যেহেতু শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধি ঘটেছে, ফলে নির্বাচনে সিপিএমকে সাহায্য করাটা শিক্ষকদের নৈতিক কর্তব্য। এইভাবে কোথাও ইউনিয়নের অধিকার, কোথাও বেতনবৃদ্ধি, কোথাও ডি এ বাড়ানো, কোথাও বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধার বিনিময়ে দলের স্বার্থে কাজ করতে বাধ্য করার এই রাজনীতি কংগ্রেসও এরাজ্যে এত নগ্নভাবে করেনি। এর মধ্য দিয় সরকারি বেসরকারি সমস্ত স্তরে পাইয়ে দেওয়ার যে মানসিকতা গত তিন দশকে সিপিএম দল ও সরকার গড়ে তুলেছে, সেই বিষবৃক্ষের ফল বিষাক্ত হতে বাধ্য। তাই প্রশাসনের সকল স্তরে নিকৃষ্ট দলবাজি, তাই দুর্নীতি ও অপদার্থতা আজ প্রকট।

পুলিশ কর্মীদের ঐ সভায় জ্যোতিবাবু আরও বলেছেন যে, তাঁরা বিরোধী দলে থাকার সময়ে পুলিশ তাঁদের ওপর অমানুষিক নিপীড়ন চালিয়েছিল। লাঠি-গুলি, গ্রেপ্তার, বিনা বিচারে আটক ইত্যাদি বহু কিছুর মধ্য দিয়ে তাঁদের যেতে হয়েছিল। ৩০ বছর আগেকার এই পুলিশি অত্যাচারের প্রসঙ্গ এখন পুলিশের সভায় হঠাৎ জ্যোতিবাবু তুললেন কেন? ১৯৭৭ সালে সরকারে বসে জ্যোতিবাবুরা নিজ দলের কর্মীদের প্রতিশ্রুতি দেন, বামফ্রন্ট সরকার কংগ্রেস আমলে, জরুরি অবস্থায় পুলিশের সমস্ত অপকীর্তির তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করবে। ক্ষমতায় বসার পর কয়েকটি তদন্ত কমিশন গঠনের কথাও সিপিএম সরকার ঘোষণা করেছিল, কিন্তু সেগুলোর কোনটাই আলোর মুখ দেখেনি। দোষী পুলিশ অফিসারদের শাস্তি হওয়া দূরের কথা, কংগ্রেস আমলে ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন করেছে এমন অফিসারদের সিপিএম সরকার যেমন প্রমোশন দিয়েছে, তেমনই কুখ্যাত পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগের বিচারে সরকার অত্যাচারিতের বদলে ঐ অত্যাচারী পুলিশ অফিসারের পক্ষ নিয়েছে। এই ভূমিকার দ্বারা জ্যোতি বসুরা রাজ্য পুলিশের উচ্চমহলে এই বার্তাই পৌঁছে দিয়েছিলেন যে, পুলিশকে তাঁরাও দলের পাশেই চান, জনগণের পাশে নয়। গত ২৮ বছরে রাজ্য পুলিশ কর্তারা তার প্রতিদান দিয়েছেন, সিপিএমের হুকুম অনুযায়ী যাবতীয় অপকর্ম করে গেছেন। যার ফলে থানা-পুলিশ এখন সিপিএমের দলীয় দপ্তরে পরিণত হয়েছে। কিন্তু সিপিএমের হুকুম তামিল করতে করতে পুলিশ যে ক্রমেই জনগণের প্রবল ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়েছে, একথাটা পুলিশের একাংশ উপলব্ধি করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিক্ষোভ দানা বেঁধেছে। এর আঁচ পেয়েই সিপিএম নেতৃত্ব এবার পুলিশ কর্মী সমিতির সভায় জ্যোতিবাবুকে পাঠিয়েছেন। সিপিএম নেতারা জানেন, ২৮ বছরের শাসনে যে নীতি নিয়ে তারা চলেছেন, তাতে জনগণের কাছে এটা পরিষ্কার যে, জনগণের স্বার্থ নয়, দেশি-বিদেশি পুঁজির মুনাফার স্বার্থ রক্ষাতেই সিপিএম নেতারা উন্মুখ। এর সাথে রয়েছে ঘৃণ্য দলবাজি ও পেশীশক্তির আস্ফালন। সবকিছু মিলে সিপিএম জনগণ থেকে যত বিচ্ছিন্ন হয়েছে, ততই তাদের মস্তান ও পুলিশি নির্ভরতা বেড়েছে। অবস্থা আজ এমন স্তরে এসেছে যে, নির্বাচনে পুলিশি সহায়তায় কারচুপি ছাড়া সিপিএমের 'বিজয়' ঘটবে না। এজন্যই এবার জ্যোতিবাবু পুলিশের সভায় গিয়ে লেনদেনের প্রসঙ্গ পেড়েছেন। যার মূল কথা — ''আমরা সরকারে বসে পুলিশকে অনেক কিছু দিয়েছি, এবার পুলিশ প্রতিদানে নির্বাচনে সিপিএমকে জেতাবার যে দায়িত্ব ২৮ বছর পালন করে এসেছে, সপ্তমবারের জন্যও সেটা করুক। অন্যরকম কিছু যেন ঘটে না যায়।' জ্যোতিবাবুর এই ভাষণই প্রমাণ করে, সিপিএম নেতৃত্ব আজ রাজনৈতিকভাবে কতখানি দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে।

র‍্যামসে ক্লার্ককে কমরেড নীহার মুখার্জীর অভিনন্দন

(ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকশন সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা, প্রসিদ্ধ আইনবিদ র‍্যামসে ক্লার্ককে অভিনন্দন জানিয়ে এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ১৪ ডিসেম্বর নিম্নের চিঠি পাঠিয়েছেন।)

মানবসভ্যতার সবচেয়ে ঘৃণ্য শত্রু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী বুশ প্রশাসনের বানানো আদালতে সার্বভৌম ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেনের বিচারের নামে যে প্রহসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং যেখানে সাদ্দাম হুসেনের আইনজীবীদের পর পর হত্যা করা হচ্ছে, সে সময় সাদ্দাম হুসেনের পক্ষে সওয়াল করার আপনার দৃঢ় ও সাহসী সিদ্ধান্তকে আমাদের দল সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া ও ভারতের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জনগণের পক্ষ থেকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। আন্তর্জাতিক সকল আইন-কানুনকে লঙ্ঘন করে, গণতান্ত্রিক ন্যায়নীতিকে দু'পায়ে মাড়িয়ে, আমেরিকাই মিথ্যা অজুহাতে ইরাকে আগ্রাসন চালিয়েছে এবং নির্বিচার বোমাবর্ষণসহ আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ অত্যাধুনিক রাসায়নিক অস্ত্র ও অন্যান্য বিধ্বংসী অস্ত্রে ইরাকের নারী-শিশু-বৃদ্ধদের হত্যা করে ইরাকের ভূখণ্ড দখল করেছে। ফলে, গণহত্যা, পরদেশ দখল, লুট-অত্যাচারের জন্য অপরাধী হিসাবে বুশ ও তার সহচরদেরই আন্তর্জাতিক আদালতে বিচার হওয়া উচিত। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে ইরাকের দেশপ্রেমিক বীর জনগণের সাহসী সংগ্রাম আজ সমগ্র বিশ্বের গণতন্ত্রপ্রিয় স্বাধীনতাকামী জনগণের কাছে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। খোদ দখলদার সাম্রাজ্যবাদী দেশের ভিতর থেকেই আপনার মতো উচ্চমানের একজন প্রখ্যাত আইনবিদ যেভাবে নিজ সরকারের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে জনগণের সংগ্রাম, ন্যায়বিচার ও মানবতার পক্ষে দাঁড়াতে এগিয়ে এসেছেন, তা নিঃসন্দেহে ইরাকি জনগণের কাছে এক বিরাট প্রেরণা। সমগ্র বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জনগণের কাছ থেকে আপনি যথার্থই আন্তরিক অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য।

অ্যাবেকার ডাকে আমরণ অনশন

একের পাতার পর

সেই কারণেই রাজ্যের কৃষি বিদ্যুৎগ্রাহকেরা গত জুলাই মাস থেকে বর্ধিত বিল না দিয়ে চালাচ্ছে বয়কট। এই বিপর্যয়ের সম্মুখীন গ্রামীণ সাধারণ মানুষের বাঁচার দাবি নিয়ে অ্যাবেকার নেতৃত্বে বিদ্যুৎগ্রাহকরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন, বিদ্যুৎমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী এমনকী রাজ্যপালের কাছেও গিয়েছিলেন। কিন্তু কোন সমাধান মেলেনি। তাই গত ২৭ অক্টোবর পাঁচ হাজার বিদ্যুৎগ্রাহক বিদ্যুৎভবনে বিদ্যুৎ পর্ষদের চেয়ারম্যানকে স্মারকলিপি দিয়ে আলোচনা করতে গিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে সংবাদপত্র এবং টিভির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দেখেছেন এই নিরস্ত্র গ্রাহকদের উপর কী বীভৎস, নৃশংস, পরিকল্পিত আক্রমণ চালানো হয়েছে। পরিকল্পিত ভাবে ইট, লাঠি, কাঁদানে গ্যাস সর্বশেষ ১৪ রাউণ্ড গুলি চালিয়ে আহত করা হয়েছে সহস্রাধিক মানুষকে। বাদ যাননি ৮০ বছরের বৃদ্ধ, মহিলা, পথচারী, বাসযাত্রী। সিকিউরিটি রুমে ঢুকিয়ে রক্তাক্ত করা হয়েছে গ্রাহকদের। রক্তস্রোত বয়ে গিয়েছে বিদ্যুৎভবন চত্বরে। এখনও খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে চাপ চাপ রক্তের দাগ। এই পাশবিকতায় গুলিবিদ্ধ হয়েছেন ২ জন, গুরুতর আহত প্রায় তিনশ' গ্রাহক। এই নৃশংসতায় গুলিবিদ্ধ খুদ্দার শেখ সহ সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে গিয়েছেন বেশ কয়েকজন। এতে কোন অনুশোচনা নেই সরকারের। স্বৈরাচারী শাসকের মতো ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে তারা ঘোষণা করেছে পুলিশ যা করেছে ঠিক করেছে, এই নৃশংসতার কোন তদন্ত করা হবে না। প্রশাসন ও সরকারের এই ঔদ্ধত্য গণতন্ত্রের পক্ষে অশনি সংকেত। মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান শ্যামল সেন নিজে প্রতিবাদ করেছেন রাষ্ট্রীয় হিংস্রতার। তাই গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের স্বার্থে প্রয়োজন নিরপেক্ষ বিচারের মাধ্যমে দোষী অফিসারের কঠোর শাস্তি।

অ্যাবেকা বলেছে, আর কিছুদিনের (জানুয়ারি মাস) মধ্যে গ্রামবাংলার গরিব চাষীদের জীবনে যে বিপর্যয় নেমে আসতে চলেছে তাকে যে কোন মূল্যে রুখতে হবে। এই মানবিক দায়বদ্ধতাকে আমরা কেউ অস্বীকার করতে পারি না। আমরা তাই কিছু গ্রাহকের আত্মাহুতির মধ্য দিয়ে লক্ষ লক্ষ কৃষি পরিবারকে রক্ষা করার জন্য আগামী ৩ জানুয়ারি থেকে আমরণ অনশন শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

কৃষক ভাইদের প্রতি অ্যাবেকার আবেদন — বোরো চাষ বন্ধ না করে বিল বয়কট আন্দোলনকে আরও জোরদার করুন। গ্রামে গ্রামে দলমত নির্বিশেষে সবাইকে নিয়ে গড়ে তুলুন প্রতিরোধ বাহিনী। প্রচার করুন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। পৌঁছে দিন আন্দোলনের বার্তা। নাম লেখান আমরণ অনশনকারী হিসাবে। আর লাইন কাটতে এলে পুরনো দরে বিল মিটিয়ে দিন। পুরনো রেটে বিল না নিতে না চাইলে মা-বোন-ছেলে-মেয়ে গ্রামের সকলে মিলে প্রতিরোধ করুন। ঘেরাও করুন পর্ষদ অফিস। পাশবিকশক্তি যত আক্রমণ করুক না কেন তার পরাজয় নিশ্চিত। মানবিক শক্তির জয় হবেই।

- **কৃষিতে বিদ্যুতের বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহার**
- **২৭ অক্টোবর সল্টলেকে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের উপর হিংস্র পুলিশি আক্রমণের নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষী অফিসারদের কঠোর শাস্তি**
- **আহতদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবিতে**

৩ জানুয়ারি কলকাতায়

অ্যাবেকার ডাকে আমরণ অনশন

স্থান ঃ এসপ্ল্যানেড (মেট্রো সিনেমার বিপরীতে)
জমায়েত ঃ কলেজ স্কোয়ার, বেলা ১টা

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in